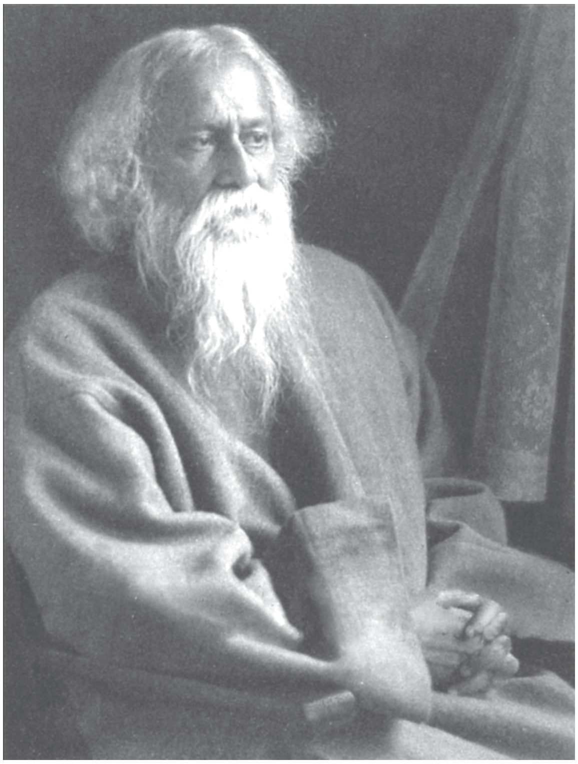

# কবিগুরুর 'জনগণমন'র জনগণেরা কি সত্যিই অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

রাজার কর্তব্য কী? আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা এককথায় উত্তর দেবেন প্রজার মনোরঞ্জন, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণ। কিন্তু আচার্য চাণক্য বলেছিলেন, রাজার কাজ প্রজার মনোরঞ্জন করা নয়। যা পেলে প্রজা আনন্দিত হয় তার ব্যবস্থা করাও নয়, বরং যা করলে প্রজার মঙ্গল সাধিত হয় সেই কাজ করা। সে কাজ যদি প্রজার চরম অপছন্দেরও হয়, প্রজার হিতার্থে রাজার সেই কাজই করা উচিত।

একটু বেমানান ঠেকলেও কথাটি সর্বৈব সত্য। ধরুন, বাড়ির শিশুটি মিষ্টি খেতে খুব ভালোবাসে। তবু মা তার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মাঝে মাঝে চিরতা বা কালমেঘের তেতো জল খাওয়ান। কেন? এতে তার শরীর ভালো থাকে। এক্ষেত্রে শিশুটি কী ভালোবাসে নয়, শিশুটির কী খাওয়া উচিত, মা সেটাই তাকে খাওয়ান। আবার ধরুন, কোনো রাজ্যে প্রজাদের নেশা করতে খুব পছন্দ। তবে রাজার কর্তব্য কী? প্রজাদের আনন্দ দিতে তাদের নেশার সামগ্রী বিতরণ করা? কোনো দেশে রাজার প্রথম কর্তব্য হলো প্রজার 'আনন্দ' আর প্রজার 'মঙ্গল'—এই দুইয়ের প্রভেদ নির্ণয় করা। আর তা না করতে পারলে প্রজার সর্বনাশ তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাজ্যেরও সমূল নাশ।

প্রাচীনকালে প্রজাকে সুখী করতে রাজা মহারাজারা কম চেষ্টা করেননি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং প্রজার ইচ্ছার মর্যাদা দিতে নিজের স্ত্রীকে দু-দুবার অগ্নি পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি জানতেন স্ত্রী সীতাদেবী নিষ্কলঙ্ক, তবু কেবল প্রজাকুলের কথার মর্যাদা দিতে মা সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন, দুই শিশু

পুত্রকে পিতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত করেছেন, নিজে কষ্ট পেয়েছেন, আর অযোধ্যা নগরীকে শ্রীহীন করে ছেড়েছেন।

বিগত তিন দশকের রাজানীতির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব চাণক্যের সেই প্রজাহিত-নীতি বর্তমান যুগে একেবারেই অচল। আজকের দিনে প্রজার মঙ্গল সাধনা নয় বরং প্রজা যা চায় তা দিয়ে প্রজাকে খুশি রাখাই রাজার ক্ষমতা দখলে রাখার একমাত্র পন্থা। কারণ এখন আর দেশে রাজতন্ত্র নেই। তার স্থানে এসেছে গণতন্ত্র। প্রজারা সকলে মিলে দেশের রাজা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। প্রধানমন্ত্রীর কাজ তাদের মনমতো হলে ভালো না হলে তাকে সরিয়ে নতুন কাউকে সিংহাসনে বসানোর ক্ষমতাও আজ সেই প্রজা অর্থাৎ জনগণের হাতে। কবিগুরু তাই এদের দেশের 'ভাগ্যবিধাতা' বলে বর্ণনা করেছেন। তবে দেশের ভাগ্য, বিধাতারূপী যে 'জনগণ'-র ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল, সেই জনগণের বিচারশক্তি কেমন, দেশভক্তি, কর্তব্যবোধ কী প্রকার, তাঁর উপরেই দেশ ও দেশনায়কের ভাগ্য নির্ভর করে। জনগণ বুদ্ধিমান হলে দেশের মঙ্গল। আর জনগণ বোধবুদ্ধিহীন, আত্মকেন্দ্রিক হলে দেশের দুর্গতি।

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে আজ মনে হচ্ছে এদেশের ১৪০ কোটি ভাগ্যবিধাতা 'জনগণ'-এর মন আজ দেশের মঙ্গল সাধনায় নয়, ব্যক্তিগত লোভ লালসার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাদের কাছে দেশ, ধর্ম, সমাজ বড়ো নয়, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য। অবশ্য ৭৭ বছর পরেই-বা বলি কী করে? ২০০৪ সালের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? ২৪টি দলের জোট সরকার গড়ে কত ঝুকি ঝামেলা সামলে প্রায় ৬ বছর ধরে তিল তিল করে যিনি এদেশকে উন্নতির শিখরে তুলে এনেছিলেন, তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ী। তাঁর পূর্ববতী সরকারগুলির বিশ্বব্যাংকের (আই.এম.এফ) দোরগোড়ায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘোর দশা কাটিয়ে ভারতকে তিনি দেউলিয়া অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। অর্থনীতিতে দেশকে স্বয়ম্ভর করে, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে, দেশকে পরমাণু শক্তিধর করে, স্বর্ণালি চতুর্ভুজ সড়ক যোজনার মাধ্যমে সারা দেশকে যুক্ত করে অবশেষে তাঁর কপালে কী জুটেছিল? ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উন্নয়নকে হাতিয়ার করে 'ভারত উদয়'-এর বার্তা দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন এদেশের 'জনগণ'-র তীব্র তিরষ্কার, হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। সেদিন এদেশের বুদ্ধিমান জনগণ বাজপেয়ীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল তারা এসব উন্নয়ন ফুন্নয়ন চায় না। বরং তারা চায় পোস্ট অফিসের ১ শতাংশ কমে যাওয়া সুদের হার বাড়িয়ে নিতে, তারা চায় ৩ টাকা পেট্রল সস্তা করতে। তাই তারা বাজপেয়ীজীকে সরিয়ে কংগ্রেসকে জিতিয়েছিলেন। বাজপেয়ী যদি সেদিন পুণরায় ঋণ নিয়ে পুনরায় ১ শতাংশ সুদের হার বাড়িয়ে দিয়ে জনগণকে কিনে নিতে পারতেন, অথবা পরমাণু শক্তিধর না হয়ে চীন পাকিস্তানের চোখরাঙানি সহ্য করে পেট্রল-ডিজেল একটু সস্তা করে দিতে পারতেন, দেশের সড়ক ও রেল যোগাযোগ লক্ষ হাজার কোটি খরচ না করে পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের মতো ঘোটালায় নম্বর-১ হতে পারতেন, তবে হয়তো তিনি আমৃত্যু ক্ষমতায় আসীন হয়ে থাকতেন। কিন্তু এগুলির কোনোটিই তিনি করেননি। কারণ তিনি চেয়েছিলেন দেশের বিকাশ, স্বাবলম্বন, শক্তিশালী দেশ। তাই এদেশের 'বিচক্ষণ' 'জনগণমন অধিনায়কেরা' বাজপেয়ীকে সরিয়ে অপাপবিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছিল।

এই ঘটনার ঠিক ২৪ বছরের মাথায় ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে এরই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছিল এদেশে। আবার সেই বুদ্ধিমান 'জনগণমন' নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের মডেলকে নস্যাৎ করে পুনরায় এদেশে পট পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিল। নেহাত মোদীজীর ভাগ্যরেখা খুব গভীর, তাই তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হতে পারেনি।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন 'Democracy is a Government of the people, by the people and for the people'। অর্থাৎ গণতন্ত্রের সবকিছুতে মানুষই শেষ কথা। কিন্তু সেই মানুষ যদি বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষিত না হয়, চতুর নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রভাবিত হয়, লোভ-লালসা-ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সে Democracy কেমন হবে—সে কথা অবশ্য লিঙ্কন তাঁর Theory of Democracy -তে লিখে যাননি। তাঁর সেই না বলা কথা এদেশের জনগণ ২০০৪-এই হোক অথবা ২০২৪, বারে বারে তাদের নির্বাচনী বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝিয়ে ছেড়েছে। প্রমাণ করে দিয়েছে তাদের কাছে বাজপেয়ীর চেয়ে মৌনমোহনো ভালো, আর মোদীর চেয়ে পাপ্পুর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বেশি দামি।

এসব দেখে মনে প্রশ্ন জাগে, এদেশের গণতন্ত্র কি সত্যিই পরিপুষ্ট? বিকাশ, উন্নয়ন, দেশের মান মর্যাদা, সুনাম, স্বাবলম্বন এসব কি কোনো সরকারকে নির্বাচনে ডিভিডেন্ড দেয়? নাকি বর্তমান যুগে ভোটের মাপকাঠি হলো দান খয়রাতি।

বিগত দশ বছরে এদেশে যা উন্নতি হয়েছে তা তো অদৃশ্য নয়, প্রকাশ্য। ঝাঁ-চকচকে হাইওয়ে, দুর্গম পাহাড়ে ফ্লাইওভার, পাহাড় ভেদ করে সুড়ঙ্গ-সড়ক, বন্দেভারত ট্রেন, রাজ্যে রাজ্যে মেট্রো, নতুন নতুন বিমানবন্দর, অসংখ্য AIMS হাসপাতাল, উন্নত চিকিৎসা পরিসেবা, আয়ুষ্মান যোজনা, সস্তার জনঔষধী, আবাস-শৌচালয়, গ্রাম সড়ক, কিষান ক্রেডিট কার্ড, কৃষক সম্মান নিধি, ফসলের সহায়ক মূল্য (MSP)—গরিব মানুষের স্বার্থে কী করেনি সরকার! যে দেশ ২০১৪-র আগে চীন পাকিস্তানের পরমাণু যুদ্ধের হুমকিতে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত, অত্যাধুনিক অস্ত্রের অভাবে ধুঁকতো—সে দেশ আজ চীনের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, Make in India-র সুবাদে বিদেশে যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানি করছে। যে চীনের ভয়ে ভারতের জাতীয় নেতারা চীন সীমান্তে যেতে ভয় পেতেন, চীন সীমান্তে রাস্তা তৈরির কথা ভাবতেই পারতেন না, সেই ভারতই

এখন চীনের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে সীমান্তে সাজিয়েছে সমর সজ্জা, ভারতের ২০ জন সেনার প্রাণ হরণের দিয়েছে যোগ্য জবাব। যে দেশ একসময় আর্থিক দুর্গতির কারণে বিদেশে ৫ টন সোনা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছিল, এই সরকারের আমলেই সেই ভারত এক টন সোনা ফেরত এনেছে। যে বন্দুকবাজরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে কাশ্মীরকে প্রায় দখল করে নিয়েছিল, সেখানে আজ জাতীয় পতাকা উড়ছে, বন্দেমাতরমের জয়গান হচ্ছে। যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একসময় পাকিস্তানের মতো থার্ড গ্রেডেড দেশের এক প্রধানমন্ত্রী 'দেহাতী গ্রাম্য মহিলা' বলে চরম অপমানকর মন্তব্য করেছিল, সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আজ আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা 'দি বস' বলে সম্বোধন করছে। সারা বিশ্বে 'বন্দেমাতরম্', 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি উঠছে—ভারতের নেতৃত্বকে বিশ্ব আজ স্বীকার করছে—এ ভারত আমরা আগে কবে দেখেছি?

কিন্তু বিগত ১০ বছরের এত সাফল্যের পরেও আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি এদেশের 'জনগণ মন'-র মনোভাবনা কেমন তা গত ৪ জুনের EVM -এ প্রকাশ পেয়েছে। মমতা-কেজরি-রাহুলের ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্টের লোভে তারা এতবড়ো দেশভক্ত বাজপেয়ীর মতো, নরেন্দ্র মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রীকে হারিয়ে দিতে উদ্ধত হয়েছিল। তারা প্রমাণ করল—কার পেটে যেন শুদ্ধ ঘি হজম হয় না—এই লোককথার সত্যতা।

সেকথা সত্যি প্রমাণ করতে এদেশের ভাগ্যবিধাতারা এবারের নির্বাচনে মমতার লক্ষ্মীভাণ্ডার, কেজরির 'ফ্রি' মডেল, আর পাপ্পুর মাসিক ৮৫০০ -এর 'ঘটাঘটে' বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের মানবতা বোধ আর আত্মসম্মান। অবশেষে প্রমাণ করেছে এই বাজারে তাদের একটি ভোটের দাম গোরু ছাগলের থেকেও কম। তারা সহজেই ৫০০, ১০০০, ৮৫০০ টাকায় বিকোতে পারে।

জনগণের এই মুড মোদীকে বুঝতে হবে। প্রয়োজনে তাকেও স্বার্থপর হতে হবে। এদেশে 'গনগণ'র মন পেতে গেলে উন্নয়ন নয়, চাই 'গিভ অ্যান্ড টেক' পলিসি। কী হবে দেশের GDP বাড়িয়ে? দেশের উন্নয়ন করে? ঝকঝকে রাস্তা করে? বুলেট ট্রেন করে? অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে? তাতে কি দেশের জনগণ আপনাকে ভোট দেবে? না, দেবে না। গোদা বাংলায় সোজা সাপটা বললে—তারা লোভী, তারা স্বার্থপর। তারা চায় টাকা, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আরও আরও টাকা। ওই ফ্রি রেশন, আর PM কিষানের টাকায় হবে না, তারা চায় ৫০০ টাকার গ্যাস, ৫০ টাকার পেট্রল। তাতে যদি দেশটা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা হয়ে যায় যাক। সেদিন যদি একটি সিলিন্ডারের দাম পাঁচ হাজারও হয়, এক কেজি চাল পাঁচশো টাকায় বিকোয়, সেও আচ্ছা। ঘরের ছেলেরা, নাতিপুতিরা যদি সেদিন ওই দেশগুলির মতো রাস্তায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়ায় সেও ভালো, কিন্তু আজ এদের শুধু ফোকটে সবকিছু চাই।

মোদীজীকে আজ এই সরল সত্যিটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে ওসব উন্নয়ন দিয়ে ক্ষমতায় ফেরা যাবে না। তাই ওসব না করে জমা টাকার ঝাঁপি খুলে দেশের মানুষের অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিন দশ, বিশ, পঁচিশ হাজার প্রতিমাসে। আপনার শেষদিন পর্যন্ত কেউ আপনার চেয়ার কাড়তে পারবে না। নাহলে আপনি কষ্ট করে, সংযম করে, কৃচ্ছসাধন করে দেশের স্বার্থে একটু একটু করে জমাবেন, আর জমিদার পুত্র পাপ্পু সিংহাসনে বসেই 'খটাখট খটাখট' করে ওড়াতে শুরু করবে। দেশের টাকা ওড়ালেই যদি ভবিতব্য হয়— তবে তা রাহুল-মমতা-অখিলেশের হাত দিয়ে কেন? আপনার জমানো টাকা আপনার হাত দিয়েই বিলিয়ে দিন। আপনি নিজেই সেই টাকা জনগণের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিন। তারা আপনাকে ধন্য ধন্য করবে, আমৃত্যু সিংহাসনে বসিয়ে রাখবে। কী হবে বিশ-পঁচিশ বছর পরে, স্বাধীনতার শতবর্ষে উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখে? আজ থেকেই ঋষি চর্বাকের 'যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেত' নীতি চালু করে দিন। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ'-রা তো আজ তাই চাইছে।

এত কিছু দেখার পরে মোদীজীর ঘাড়ে যদি আবার উন্নয়নের ভূত চাপে তবে একটি বিষয়ে তাকে সচেতন হতে হবে। সাবধান! এই উন্নয়ন করুন, কিন্তু সবার জন্য উন্নয়ন নয়। Selective উন্নয়ন চাই। যেমন করে মমতা, সিদ্ধারামাইয়ারা পশ্চিমবঙ্গে, কর্ণাটকে উন্নয়নের সময়েও কোন দলের ভোটার তা যাচাই করে নেন, সেটাও এবার থেকে মোদীজীকে রপ্ত করা শুরু করতে হবে। আবাস যোজনার ঘর নেবে, শৌচালয় নেবে, উজালা গ্যাস নেবে, ফ্রি রেশন নেবে, কিষাননিধি নেবে আর ভোটের পর ইভিএম খুললে সব ভোট মমতা-অখিলেশ আর কংগ্রেসের—এ আর চলবে না। পঞ্চায়েত, বিধানসভায় ইভিএম-এ ৭০ শতাংশ ভোট পেলে তবেই পাড়ায় পাড়ায় মিলবে সরকারি সুবিধা—দাদা দিদিদের মতো এই নীতি চালু করতে হবে।

কিন্তু জানি না মোদীজী এই 'শঠে শাঠ্যং' পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবেন কিনা। কারণ আপনার রক্তে যে শুধু শ্বেত কণিকা আর লোহিত কণিকা নেই, তার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রভক্তির লক্ষ লক্ষ কণা প্রতিনিয়ত তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই ওরা যা পারে তা হয়তো আপনি কখনই করতে পারবেন না। তবু বলব, সুশাসন এক জিনিস আর ভোটের রাজনীতি অন্য জিনিস। উন্নয়নে আপনি পি.এইচ.ডি বটে কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে আজও আপনি এই দেশের লোভী স্বার্থপর জনগণকে চিনতে অপরাগ। এবার থেকে চিনতে চেষ্টা করুন। কারণ আপনি হেরে গেলে আপনার সঙ্গে এদেশের কোটি কোটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশভক্ত, নিঃস্বার্থ হিন্দুর আশা-আকাঙ্ক্ষাও চিরতরে সমাপ্ত হয়ে যাবে। তার স্থানে দখল নেবে 'জয় সংবিধান' বলে ভাঁড়ামো করা গণতন্ত্রের নামাবলী চড়ানো ছদ্ম ঘোরি-তৈমুর-ঔরঙ্গজেবের দল। এরা একবার ক্ষমতায় এলেই এদেশে চালু করবে শারিয়তি শাসন। তাই নিজের স্বার্থে আর দেশের স্বার্থে সতর্ক হোন। তাতে আমাদের সকলের মঙ্গল।

# দিনের শেষে

এষা দে

মা, একটু ফ্যান দাও, মাগো....। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে কঙ্কালসার মানুষের দল। ক'দিন ধরেই দেখছে, শুনছে। যেমন শুনছে কলকাতার আর পাঁচজন গৃহস্থ। পাঁচজনের মতো ফ্যান দিয়েছে, তাই নিয়ে কাড়াকাড়িও দেখেছে। তারপর সাধ্যমতো তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। যা আর পাঁচজন করেনি।

'হরি, গেট খুলে দে। ভিতরে উঠোনে ওদের নিয়ে আয়। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর খিচুড়ি আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে কিনা। বাজার থেকে আনা কলাপাতাগুলো ধুয়ে রেখেছিস তো? যা ওদের সারি দিয়ে বসা.....।'

বিদেশি শাসকের বিশ্বযুদ্ধের জোগান দিতে কলোনির মানুষের মুখের গ্রাস চালান যাচ্ছে। বঙ্গপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী সুরাবর্দি আর খাদ্যশস্য সরবরাহের একচেটিয়া লাইসেন্স ইস্পাহানির। এই তো পূর্ব ও পশ্চিম মিলে যুক্তবঙ্গ, আমাদের সোনার বাঙ্গলা। না, পারতপক্ষে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে যে অন্য জগতের মানুষ।

'নিত্যদিন কাঙালি ভোজন চলবে কি?' খাওয়া শেষে মুখ ধুইয়ে লোকগুলোকে বিদায় দিতে দিতে গজগজ করে হরি।

'হ্যাঁ, চলবে। এ নিয়ে কারও মুখে আওয়াজটুকু যেন না শুনি।'

'কেই-বা তোমার আছে এ বাড়িতে যে আওয়াজ করবে? দেশে জমিজায়গা, বাপের ভিটে, বিধবা মা একলা আগলে রয়েছেন। দাদা-দিদিরা সব যে যার জায়গায় বড়ো বড়ো চাকরিবাকরি, সংসার করছে। তুমি কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে অষ্টপ্রহর গানবাজনা নিয়ে পড়ে রয়েছে। এত বয়স হলো সংসার ধর্ম করার নাম নেই, সব ঝক্কিঝামেলা...।'

'যা, যা তোর ওই ভাঙা রেকর্ড আর বাজাস না। খালি সংসার আর সংসার। কত বার না বলেছি যা বুঝিস না তাই নিয়ে মাথা ঘামাবি না। আমার কাছে গানই সব।'

হরি নাছোড়বান্দা। 'কেন গান করে কি বিয়েথা করা যায় না? দাদা-দিদিরা কে না গান করে। তেনারা কলকাতায় এলে বাড়ি এক্কেবারে জমজমাট। তোমার মতো উড়নচণ্ডী কে?'

সত্যি, সে আর সকলের মতো নয়। খুলনায় তাদের পৈতৃক গ্রামে যেখানে তাদের ক'পুরুষের ভিটে মাটি জমিজায়গা কি সদর শহরে, যেখানে তার বাবা বাড়ি করেছিলেন, চারিদিকে আত্মীয় স্বজনের বাস, সেখানেও কি মানাতে পেরেছিল? বরং বারবার ছিল একটা ব্যতিক্রম। তার তিন দাদা-দিদি যেমন হাসিখুশি তেমন মিশুকে। পালাপার্বণে, পাড়ায় কী স্কুল কলেজে ফুটবল খেলা বা কোনো অনুষ্ঠানে, সর্বত্র তারা কেমন মাতিয়ে দিত সে গল্প সকলের মুখে মুখে। কিন্তু অমলেন্দুর সঙ্গে তাদের বয়সের এত পার্থক্য যে তারা প্রায় গুরুজন, ভাই-বোন হিসাবে সমকক্ষতার সম্পর্ক হয়ই নি। ফলে বাড়িতে সে একলা, সর্বদা চুপচাপ, নিজের মনে থাকে এবং একা থাকতে ভালোবাসে। বাড়ি, পাড়া, স্কুল-কলেজ সবই তার কাছে জেলখানার মতো লাগে। কেমন যেন বদ্ধ দুনিয়া। হাঁপ ধরে যায়। এর বাইরে কি কিছু নেই! ঠিক নিজেও বোঝে না কী চায়।

পরিবারের সকলের মতো তারও জন্ম থেকে গলায় সুর। বাবার কাছে ধ্রুপদ ধামারে হাতে খড়ি। কিন্তু মন ভরে না। আরও কী তার চাই। একমাত্র কাছের মানুষ মা। মাকেও যে কী চাই না চাই মন খুলে বলত এমন নয়। মায়ের সময় কোথায়, সারাদিনই তো ব্যস্ত। তাই ঘরে মায়ের পুজোর সময় প্রায়ই ঢুকে পড়ে। মা স্নান করে পিঠ ছাপানো খোলা চুলের তলায় একটা গিঁট দিয়ে পুজোর জন্য লালপাড় মটকা শাড়িটা পরে ঠাকুরের সামনে বসে। এক মনে মাথা নীচু করে মা পুজোর কাজ করে যান। কপালে সিঁদুরের টিপ থেকে একটু গুঁড়ো ঝরে পড়ছে নাকের ডগায়। অমল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কতক্ষণই-বা সময়। তাই-ই অমলের কাছে ঢের। শেষে প্রসাদি বাতাসাটা তার হাতেই তুলে দিয়ে হেসে বলেন, 'ওরে লোভী ছেলে, এই জন্যই এত ঠাকুর ভক্তি বুঝি?' বলতে পারে না, 'ঠাকুরের জন্য নয়, তোমার কাছে থাকার জন্য। 'অন্য ছেলে-মেয়েদের থেকে তাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিতেন কি? কেউ কোনও সমালোচনা করলে মা তার পক্ষ নিয়ে উত্তর দিতেন,' হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়। ওকে ওর মতো থাকতে দাও।

বাবাও মায়ের মতো তাকে স্পেশাল ভাবেন, তবে একটু অন্যভাবে। তিনি আবার ব্যাখ্যা জোগান, 'আসলে ওর সময়টাই গোলমেলে। ও জন্মাল আর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দুই বঙ্গ মিলে বঙ্গদেশ হলো। যা ইতিহাসে কখনো হয়নি। আগে ইংরেজের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে দুই বঙ্গ ছাড়া পুরো অসম, ওড়িশা, বিহার কী বিরাট এলাকা ছিল আমাদের। মোগল আমলেও সুবা বাঙ্গালায় ছিল উড়িষ্যা বিহার। এখন যুক্তবঙ্গে বাঙ্গালি হয়ে শুধু পদ্মার এপার আর ওপার নিয়ে থাকো।

রেকাবিতে ক'টা নাড়কেল নাড়ু নিয়ে মা পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে সকলের হাতে দিতে দিতে বলেন, 'সে কী, তোমরাই না কার্জন সাহেবের বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে আন্দোলন করলে? যার জন্য কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লি চলে গেছে। তোমরা দিব্যি মেনে নিয়েছ।' বাবা কপালে হাত দিয়ে বলেন, 'সবই বুদ্ধির দোষ। রাজধানী চলে যাওয়ার কতদূর কী ফলাফল তা বোঝার ক্ষমতা এই হতভাগা জাতের কি ছিল! এখন দেখ যুক্তবঙ্গে তোমার এই ছেলের কপালে কী লেখা আছে।

বাকি রইল সবচেয়ে ছোটো অমলেন্দু। দাদাদের উপদেশ ও সাবধান বাণী মনে রেখে ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় তার দুরুদুরু বক্ষে কলকাতা আগমন। এসেই শোনে দাদারা যা বলেছিল তাই ঠিক, কলেজের হোস্টেলে গানের নিয়মিত রেওয়াজ করা শক্ত। তবে শিয়ালদা হ্যারিসন রোড পাড়ায় প্রাইভেট মেসে অনেক ছাত্র দল বেঁধে থাকে। সেখানে চেষ্টা করে দেখতে পারে। তারই একটায় এসে ওঠে। যেই তার মালপত্র থেকে হারমোনিয়াম বেরল—পাখোয়াজটা তো প্রথমেই আনতে ভরসা পায়নি—ব্যস, অমনি হইচই। 'না, মশাই, এখানে পাঁচজন

ভদ্রলোকের বাস, ওসব গানটান চলবে না।'

'ঠিক আছে, ক'দিন আমাকে সময় দিন, অন্য জায়গা দেখে নিয়ে উঠে যাব।'

যাওয়া আর হলো না। দুদিনেই মেসের বোর্ডাররা দু'দলে ভাগ, এক দল তার সংগীত চর্চার পক্ষে, অন্য দল বিপক্ষে এবং ক্রমে প্রথম দল সংখ্যা গরিষ্ঠ। তাদের চাঁই, নবদ্বীপের ছেলে সংস্কৃতি মনস্ক মনোজ দত্তের ঘোষণা, 'কে তোমাকে তাড়ায় দেখব। অমলেন্দু তুমি নিশ্চিন্তে রেওয়াজ কর।'

তবে শান্তিরক্ষার জন্য তাকে ছাদের চিলেকোঠায় তুলে দেওয়া হলো। হ্যাঁ, ঘরটাকে বাসযোগ্য করতে একটা তক্তপোশ ও টেবিল ফ্যান এল। চিলেকোঠা বলে মালিকের কাছ থেকে কনসেশান তারাই আদায় করল, ('ওটা কি বোর্ডার থাকার মতো ঘর নাকি। বেচারা শিল্পী মানুষ, আপনি তার সুযোগ নিচ্ছেন' ইত্যাদি)। খুলনার বাড়ির পরিসর, স্বাচ্ছন্দ্য, মায়ের রান্নার স্বাদ, ছুটিতে গ্রামে মাঠেঘাটে মুক্ত বিহার, পুকুরে হুটোপাটি আর এখানে এই ঘিঞ্জি গলির মধ্যে এক চিলতে ঘরে বাস আর অখাদ্য মেসের খাওয়া। চিরকাল চাপা স্বভাব অমলেন্দু কারোকে কিছু লেখে না বা বলে না।

কলকাতায় দুজন ওস্তাদের রেফারেন্স তার সঙ্গে। তাঁদের একজন, দবির খাঁর শিষ্যত্ব সঙ্গে সঙ্গে। তাঁরই মাধ্যমে একটা পুরনো তানপুরা জোগাড় হয়ে গেল। তালিম নিতে গিয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয়। ক'মাসের মধ্যে দেখে পুকুর থেকে সে এসে পড়েছে মহাসমুদ্রে। কী না আছে কলকাতায়, কত ওস্তাদ, কত ধরনের সংগীত, ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ঠুংরি তো আছেই, আছে দাদরা, কাজরি, গীত গজল, কীর্তন ভজন, রাগপ্রধান কাওয়ালি, সব কিছুর চর্চা। যা ইচ্ছে শিখতে পারে। তৃষ্ণার্তের সামনে সারি সারি সুশীতল পানীয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে, সব তার শেখা চাই। সব সব। রপ্ত করা চাই হিন্দি, উর্দু। হ্যাঁ, কলেজে নামটা লেখা, কিন্তু মনপ্রাণ পুরো গানে ওস্তাদ দবির খাঁ দিলওয়ার খাঁ কত খাঁয়ের কাছে কত ধরনের গানে তালিম।

তিন ছেলে-মেয়ে তো দাঁড়িয়ে গেছে, এখন ছোটো ছেলের শখ মেটাতে মা উদ্‌গ্রীব। খরচ বাবা দিলেন বটে কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না, ছেলের বিএ বিএল, হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে চলেছে। পেট কীসে চলবে সে নিয়ে প্রতি চিঠিতে তাঁর উদ্বেগ সুস্পষ্ট। তাঁর কাছে সংগীত একটা বিশেষ কৃত্য, পুজোআর্চার মতো কর্মজীবনের বাইরে। তার উপস্থাপনা ও সমাদর সমাজের উচ্চবর্গের সমঝদার অতি ক্ষুদ্র বৃত্তের মজলিসে। নেহাত শখ। চিঠিতে লেখেন, 'গানের চর্চা আমাদের পুরুষানুক্রমিক। তোমার দাদা-দিদিরাও করে। তবে আসল কাজ, অর্থাৎ জীবিকা অর্জন, সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিয়া তাহারা গান গায়, অবসরে। তুমি কী করিবে ভাবিয়াছ? পুরুষের পরিবার প্রতিপালন, জীবিকার দ্বারা উপার্জন এবং দেশ ও দশের একজন হওয়া অবশ্যকর্তব্য। আজ হউক কাল করিতেই হইবে। চিরকাল ওস্তাদজীদের নিকট তালিম লইয়া দিন কাটিবে না, আমার বয়স হইতেছে,' ইত্যাদি।

অমলেন্দু নীরব। গান ছাড়া আর কিছু করবার কথা ভাবতেই পারে না। দাদাদের মতো ভালো চাকরি, বাবার মতো পেশা, কোনো কিছুর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। এমনকী গানের ব্যাপারেও সে তাদের থেকে এরই মধ্যে ভিন্ন হয়ে গেছে। বাবা দাদাদের মতো সে শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আজকাল নতুন ঢেউ উঠেছে, গীতিকবিতায় সুর বসিয়ে গান। কথাকে সুরে প্রকাশ এখন মস্ত চ্যালেঞ্জ। তার কী জনমোহিনী আকর্ষণ। কৃষ্ণচন্দ্র দে (ওরফে কানাকেষ্ট), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় নতুন ঢেউয়ের অগ্রদূত। তার আদর্শ। বিএ পরীক্ষাটা কোনক্রমে দিয়েই হাজির হয়ে গেছে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছেও তালিম নিতে। অল্প দিনেই হয়ে উঠেছে প্রিয় শিষ্য। প্রথাগত শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা তার মাথায় উঠল। সে যেন কথা আর সুরের মায়ায় নেশাগ্রস্ত। এমনই ডুবে গেল যে হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাবার মৃত্যুসংবাদও তাকে যেন তেমন স্পর্শ করল না। বরং তাঁর নিয়মিত উপদেশ বর্ষণ থেকে রেহাই পেয়ে যেন স্বস্তি। হ্যাঁ, দেশে গিয়ে সকলের সঙ্গে অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধশান্তি যথাবিহিত সম্পন্ন করেছে। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ফেরার আগে মাকে বলতে গেল তার কলকাতার খরচ আর দরকার নেই। একটা কিছু দেখে নেব, বিএটা পাশ তো করে গেছে। দাদারা হাঁহাঁ করে উঠল', বাবা নেই তো কী, আমরা তো আছি। তুই শুধু ছোটো ভাই নস, আমাদের হাঁটুর বয়সি। তোর দাঁড়ানো অব্দি ক'বছরের খরচা—'মা বাধা দেন, তোমাদের বাবা কলকাতায় ওর আরও ক'বছর চলার মতো সংস্থান করে গেছেন। তোমাদের কিছু দিতে হবে না।'

ফিরে এসে শাস্ত্রীয় সংগীত ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে তালিমে লেগে পড়ে পুরো দমে। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর পয়লা নম্বরের শিষ্য।

একদিন বললেন, 'অমলেন্দু, এবারে পাঁচজনের সামনে তোমার গাওয়া দরকার। শোন, পাথুরিয়াঘাটায় মল্লিকদের বাড়ি রাসপূর্ণিমায় বৈঠক বসছে, নানা ধরনের গাইয়ে আসবেন। আমি বলেছি সেখানে তুমি গাইবে।'

অমলেন্দুর তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া। বাইরের কারও সামনে সে মুখই খুলতে পারে না, গান গাওয়া দূরের কথা। 'আমি তো সবে শিখছি, সকলের সামনে গান গাইবার মতো—'

'আরে প্রথম প্রথম সকলের নার্ভাস লাগে। চোখ বুজে আমাকে স্মরণ করে গান ধরবে। দেখবে কোনও সমস্যা হবে না।'

হলো না। এবং প্রথম প্রকাশেই তার ভাগ্য খুলে গেল।

আসরে নক্ষত্র আকর্ষণ ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সে যখন দ্বিতীয় গানটা ধরেছে তখন তাঁর প্রবেশ। গাওয়া সেরে তাঁকে প্রণাম করতে গেছে। কবি তাকে সাদরে দুহাতে ধরে বললেন, 'তুমি তো নেহাত ছেলেমানুষ হে। এই বয়সেই কামাল করে দিয়েছ। কতদিন ধরে শিখছ? কী, কী বললে? মাতৃগর্ভে থাকতে? বাবা, মা গান করেন। বাহ্ চমৎকার। এই না হলে এখনই এমন তৈরি গলা, এমন মুনশিয়ানা।'

তাকে পাশে বসান। আসর শেষ হলে তার পরিবার, মূলবাড়ি, ঠিকানা ইত্যাদি খবরাখবর নিয়ে শেষে জিজ্ঞাসা, 'তুমি কি কোনো চাকরিটাকরি কর? না? পরশু এগারোটার সময় এইচ এম ভির স্টুডিয়োতে আমার সঙ্গে দেখা কর।'

হিজ মাস্টার্স ভয়েস তখন সবচেয়ে নাম করা রেকর্ড কোম্পানি। বিরাট চোঙওলা গ্রামোফোনের সামনে কান খাড়া করে শুনছে একটি কুকুর। সুপরিচিত চিত্রটি তার লোগো, বলতে গেলে কলের গানের সঙ্গে একাত্ম। নজরুল সেখানে প্রধান মিউজিক ট্রেনার। তাঁর সুপারিশে কিছু দিনের মধ্যেই অমলেন্দু অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনার হিসেবে যোগ দিল। বেরল তার নিজের সুরে নিজের গলায় গাওয়া প্রণব রায়ের লেখা আধুনিক গানের রেকর্ডও। নজরুলের উপদেশে 'ইন্দু' ত্যাগ। অমল সেনগুপ্ত প্রথম রেকর্ডেই সকলকে মুগ্ধ করল।

।। দুই ।।

সে একটা নতুন যুগ। এতকাল রাজরাজড়া, নবাব বাদশা, অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর মুষ্টিমেয়র জন্য ছিল মার্গ সংগীত, অন্য দিকে গ্রামের মাঠেঘাটে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের লোকগীতি। মাঝখানে কিছুকাল ধরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে শাক্ত-বৈষ্ণব ভক্তি গীতি। আধুনিক শিক্ষার মুখদেখা, ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা পড়া মধ্যবিত্তের জন্য কী আছে? বিশ শতকের গোড়ায় এসেছে রেকর্ড বা কলের গান, ত্রিশের দশকে স্থাপিত অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো, শুরু বাংলা সবাক চলচ্চিত্র। ত্র্যহস্পর্শ। সংগীত এখন শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছতে পারছে। একটা গান মানে একটি পণ্য যার উৎপাদনে তিনটি স্তর—গীতিকার লেখেন, সুরকার সুর দেন, গায়ক গেয়ে রেকর্ডে, রেডিয়ো, সিনেমায় অসংখ্য শ্রোতাকে পৌঁছে দেন। প্রতিটি স্তরে পেশাদারিত্ব, যোগ্যতার পরিচয়। ফলশ্রুতি প্রচুর উপার্জন, খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা। যা আগে কখনো হয়নি। অমলের সামনে ম্যাজিকের মতো খুলে গেল নতুন এক আশ্চর্য জগতের দ্বার যেখানে রাজত্ব করেন অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়ের মতো গীতিকার; হিমাংশু দত্ত, রাইচাঁদ বড়ালের মতো সুরকার; ইন্দুবালা কমলা ঝরিয়ার মতো শিল্পীরা। আরকানা কেষ্ট বা পঙ্কজ মল্লিক তো সব্যসাচী। দেখতে না দেখতে তাঁদের অনুসারী হয়ে অমল এখন উঠতি তারকা, একাধারে সুরকার ও গায়ক। বাংলা ছায়াছবিতে সুর দিতে ডাক পড়ে। তার চেহারা, সাজপোশাক সব হাল ফ্যাশনের, বাবার শ্রাদ্ধের সময় মাথা কামানোর পর আবার দিব্যি ঘন ঢেউ খেলানো চুল গজিয়েছে, এক পাশে সিঁথি কেটে থোকা থোকা কানের ওপর। আর কৈশোরের ভাঙা গাল এখন পুরন্ত, নাকের তলায় ওষ্ঠাধরের ওপরে হাল ফ্যাশনের একটু গোঁফ। পরনে হাফ শার্ট আর মিহি ধুতি।

মেসের চিলেকোঠা থেকে একটা তিনতলা বাড়ির একতলা বড়োসড়ো ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে। আজ হোক কাল হোক মা নিশ্চয় এসে তার সংসার করাবেন, দাদা-দিদিরা সকলেই চান কলকাতায় পরিবারের একটা বাসা হোক। পূর্ণেন্দুর সারা রাজ্যে বদলির চাকরি, মাঝে মাঝে রাইটার্সে আসতেই হয়, অমলেন্দুর বাসা হওয়াতে খুব সুবিধা, কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে ওঠার বাধ্যবাধকতা আর নেই। ভাইপো, ভাগ্নে, দিদি, বউদিরা বড়দিনের ছুটিছাটাতে এসে হইহই করে যায়। যেন খুলনার একটা শাখা তার বাসা। এখন সে আর শান্ত এক কোণে পড়ে থাকা বালক কিশোর নয়। কেউকেটা হতে চলেছে। শুধু মা এলেই সোনায় সোহাগা হতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার আগেই অমল একটা গোটা দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ফেলে। পাহারা দেওয়ার বিহারি দারোয়ান, বালেশ্বর থেকে রান্নার ঠাকুর, ফাইফরমাসের চাকর মেদিনীপুরের, মোটা কাজের ঝি স্থানীয়, সব মিলিয়ে পুরো দস্তুর কলকাতার স্টাইলে সংসার। এবং সে এখন কর্তা। আসবাবপত্র দিয়ে সাজায়, মেসে তার সেই প্রথম ভক্ত মনোজ, এখন ঘনিষ্ঠ সহচর, তার পরিবারের ছোটোদের মনোজকাকু হয়ে গেছে, তরুণ গায়ক সুরকার অমল সেনগুপ্তের শ্রোতা, ভক্ত, মোসাহেব জোগাড়ে এক্সপার্ট। হরদম তার বাড়িতে তাদের আনাগোনা। যদিও অমল ব্যস্ত, সময় দিতে পারে না। তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, অমলের হুকুম তো জানা কথা। হরি, মোড়ে বিষ্টুর দোকান থেকে ক'টা গরম গরম বেগুনি আর আলুর চপ নিয়ে আয়। সঙ্গে দুটো মুড়ি মেখে আনিস। তারপর ঠাকুরকে বল ছ'টা চা দিতে।' অমলের দুহাতে উপার্জন, দুহাতে খরচ। অতিথি সৎকারে কার্পণ্য নেই।

দশ বারো বছরে কত কী ঘটে গেল। যখন অমল সদ্য এ জগতে পা রেখেছে, সেই সময় একদিন নজরুলের কাছে এল নেহাত সাদামাটা পাতলা একহারা শ্যামবর্ণ একটি কিশোরী, সংকোচে জড়সড়। ভারিক্কি চেহারার অভিভাবিকা বিধবা মা সঙ্গে এসেছেন। গাম্ভীর্যে ও আত্মম্ভরিতায় মেয়ের কুণ্ঠিত বিনয়নম্রতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখছেন। জানালেন মেয়ের গানের প্রতিভা জন্মগত, কাজী সাহেবকে তার গান শোনাতে

চান। নজরুলের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। পিতা-মাতার কণ্ঠে সন্তানের এমন 'প্রতিভা'র বড়াই তাঁর বড়ো পরিচিত।

'বেশ তো, গাও যা তোমার ইচ্ছে।'

স্মিত মুখে বলেন নজরুল। মেয়েটি ধরে একটি মীরার ভজন। অতি সুমধুর কণ্ঠ, উচ্চগ্রামে বাঁধা, যেমন সুরের সাবলীল চলন, তেমনই আন্তরিকতা। গাইতে গাইতে মেয়েটির চেহারাই যেন বদলে গেল। মুখে চোখে সারা দেহে এক আত্মহারা ভক্তপ্রেমিকার প্রকাশ। আশ্চর্য রূপান্তর। অমল তো বটেই, নজরুল পর্যন্ত অভিভূত। 'বাহ, চমৎকার গেয়েছ। তোমার নামটা এখনো জানা হয়নি।'

'আমার নাম শেফালিকা চৌধুরী।' তেমনই নতমস্তক, মাটির দিকে দৃষ্টি, এক হাতে সরু নীল পাড় সাদা শাড়ির আঁচল ধরা। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্মুষিকভব, সেই জড়সড় সংকুচিত নতমুখী নেহাত সাদামাটা কিশোরী।

'ওর রেকর্ড বের করুন।' গর্বিত মাতৃদেবীর অনুরোধ। নজরুল মানলেন রেকর্ড করার মতো যোগ্যতা মেয়েটির আছে। অডিশান ইত্যাদি টেকনিকালিটি চুকলে গান বাছাই করতে বসা হবে। এর মধ্যে অমলের মনোজ দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি খবর আনে এঁরা বর্ধমানের অমুক গ্রামের একদা ডাকসাইটে জমিদার অমুক রায়চৌধুরীর বংশ, যাদের শ্রেণীসুলভ সব দোষই ছিল, অতঃপর দু'পুরুষ ধরে বাবুয়ানি, শরিকানা ঝগড়া আর মামলা মোকদ্দমায় এখন অবস্থা পড়ে গেছে, উত্তর কলকাতায় বড়ো একটা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই তেমন নেই, এমনকী নাম থেকে 'রায়' বাদ দিয়ে শুধু 'চৌধুরী' হয়ে গেছেন। তাই আভিজাত্য শিকেয় তুলে মেয়েকে লোকের সামনে গান গাইয়ে বিধবা মায়ের কিছু রোজগারের ধান্দা।

সব শুনে অমল বলে, 'এতে শেফালিকার কী দোষ? বাপ ঠাকুর্দা যাই করুক না কেন, মেয়েটি গায় চমৎকার। কাজীসাহেব বলেন ওর ভবিষ্যৎ আছে।'

শেফালিকার হয়ে সব কথাই বলেন তার মা। জানালেন তাঁদের পরিবার ঘোর বৈষ্ণব, বাড়িতে নারায়ণ অধিষ্ঠিত, নিয়মিত পূজা থেকে সব আচার আচরণ পালিত, মেয়েও অতি ভক্তিমতী, মীরার ভজনই রেকর্ড করবে। নজরুলের ঘোর আপত্তি, 'দেখুন মীরার ভজন ভারতবর্ষ সুদ্ধ গায়িকারা গায়, প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, এতটুকু মেয়ের পক্ষে প্রথমেই ভজন গায়িকা হিসেবে দাঁড়ানো শক্ত হবে। তার চেয়ে আজকাল যে আধুনিক গান উঠেছে, তাই দুটো প্রথমে রেকর্ড করুক। যদি লোকে নেয়, তো ভবিষ্যৎ তৈরি। তারপর ধীরে সুস্থে মীরা, কবীর, সুরদাস, যত ইচ্ছে ভক্তির গান গাইবে। 'অমলকে দেখিয়ে বলেন', এই হচ্ছে অমল সেনগুপ্ত, উঠতি গাইয়ে শুধু নয়, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, শেফালিকাকে গাইড করবে।

মহিলা অমলের আপাদমস্তক সার্চলাইটের মতো চোখ বুলিয়ে নিরাশ স্বরে বলেন, 'এ তো নেহাত ছোকরা। আপনি সিনিয়র, তাছাড়া আপনার মতো নামডাক আজ বঙ্গের আর কার? আমি চাই আপনি নিজে আমার মেয়েকে ট্রেনিং দেন।

'নজরুল হেসে বলেন, 'আমার চেয়ে অমল আপনার মেয়ের পক্ষে ভালো হবে। ওই যে বললেন নাম ডাক, ওটাই তো জ্বালা। হাজার রকমের কাজ আমার, শুধু গ্রামোফোন কোম্পানির ট্রেনারই তো নই। একজন নতুন গাইয়েকে তালিম দিতে যে সময় দেওয়া দরকার তাতো আমি দিতে পারবো না। অমল সময় দিতে পারবে। তা ছাড়া ও বয়সে নবীন হলে কী, গানের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। আপনার মেয়ের বলছেন জন্মগত প্রতিভা, অমলের প্রতিভা মাতৃগর্ভ থেকে। পরিবারে পুরুষানুক্রমিক সংগীত চর্চা। দিব্যি জুটি হবে। ভবিষ্যদ্‌বাণী করে দিলাম, হা হা হা।' তাঁর বিখ্যাত প্রাণখোলা হাসি হাসেন।

শেফালিকা তাঁর পরামর্শে জনসমক্ষে হলো শেফালি। যথাসময়ে অমল সেনগুপ্তের সুরে ও পরিচালনায় শেফালি চৌধুরীর প্রথম গান 'আমি যে ঝরা শেফালি' এবং 'জানি জানি তুমি আসিবে না', প্রকাশিত। এক্কেবারে সুপার হিট। তিন মাসে ৬০ হাজার ডিস্ক বিক্রি। চব্বিশ বছরের সুরকার, চোদ্দ বছরের গায়িকা। জন্ম নিল এক কিংবদন্তী তারকাযুগল, অমল সেনগুপ্ত - শেফালি চৌধুরী। ক্রমে অমল আর শুধু সুরকারের ভূমিকায় থাকে না, সেও তো মূলত গায়ক। পর পর বেরতে থাকে কখনো শেফালির একার, কখনো-বা অমলের সঙ্গে শেফালির দ্বৈত সংগীত। চলচ্চিত্রে ডাক পড়ে। প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। আরও ছায়াছবি হচ্ছে। রোমান্টিক দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার ঠোঁটে অমল-শেফালি বক্সঅফিস টানে। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে তাদের খ্যাতি মধ্যগগনে। বি এফ জে এ-র অ্যাওয়ার্ড হতে না হতে অমলের শ্রেষ্ঠ সুরকারের পুরস্কার লাভ। সবচেয়ে খুশি নজরুল, তিনি এতদিনে তাদের কাছে কাজীদা এবং অমল শেফালিকে তাঁর তুইতোকারি সম্বোধন।

কিন্তু শেফালির নীরবতা, তার সেই নতমুখী সংকোচ ভঙ্গির কোনো পরিবর্তন নেই। অমল উন্মুখ হয়ে থাকে তার গান শুরুর জন্য। কখন তার আসল সত্তা প্রকাশ পাবে, মিলন-বিরহ-আকুতি সব অনুভূতি তার মুখে চোখে সারা দেহে। একদৃষ্টে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। গানের ক'মিনিট যেন অনন্তকাল। যেই শেষ হয় অমনি আবার সেই শক্ত খোলসের মধ্যে ঢুকে যায় শেফালি। এদিকে অমলের হৃদয় উদ্বেল। সে ম্যাজিকের মতো নিজেকে বদলাতে পারে কই। গানের শেষে বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা। অন্যরা অপ্রস্তুত বোধ করে। দিনের পর দিন দুজনের দেখা হয়, গানের তালিম, রেকর্ডিং, সব হয়। শুধু হয় না দুজনের মধ্যে গান ছাড়া আর কোনো বিষয়ে আদানপ্রদান। তাদের সম্পর্ক সেই প্রথম দিন যেখানে শুরু হয়েছিল, সেই এক জায়গায় স্থানু।

সারাটা দিন অমলের কাটে অসীম ব্যস্ততায়। ওস্তাদজীদের কাছে পালা করে তালিম ছাড়েনি, গ্রামোফোন কোম্পানির চাকুরিতে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার রেকর্ডিং তত্ত্বাবধান, ফিল্মে সংগীত পরিচালনা, তার মধ্যে প্রতিদিনের সংসারের কর্তাগিরি। আবার বাড়ির ছেলে হয়ে, ভাইফোঁটার সময় প্রতি বছর জামশেদপুরে দাদাদের সঙ্গে দিদির বাড়িতে, গ্রামের পিতৃপুরুষের ভিটেয় বরাবরের মতো দুর্গাপূজায় দাদা-দিদিদের মতো অমলও নিজের বাড়ি যায়। মায়ের আশঙ্কা, 'যাতায়াত না থাকলে পরিবার ভেঙে যাবে'। তিনি নিজে অবশ্য খুলনার সংসার ছেড়ে বেরতে পারেন কই। কলকাতায় অমলের সংসারে পা রাখা হয়ে ওঠে না। তবে প্রতি সপ্তাহে দু'লাইনের অন্তত চিঠি তাঁর অমলের কাছ থেকে পাওয়া চাই। সব মিলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। ঝড়ের বেগে কাটে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। শুধু ঘুমের মধ্যে যেন অবসর। অমল মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখে ঔদাসীন্যের বর্ম ছেড়ে রূপান্তরিত শেফালি, প্রাণবন্ত, আবেগে বিহ্বল, তার কত কাছাকাছি। যেই ছুঁতে যায় অমনি ঘুম ভেঙে যায়। শয্যায় সে একলা।

এদিকে শেফালির সঙ্গে তার গানের সূত্রে আদানপ্রদান সর্বজনবিদিত, মনোজ অ্যান্ড কোম্পানির কাছে মৃদু পরিহাসের বিষয়, পরিবারে কিঞ্চিৎ উদ্বেগের। এইতো সেদিন মায়ের চিঠি এসেছে।

'কল্যাণীয় অমু,

আশা করি তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল। আমার বয়স হইয়াছে। তোমার দাদা-দিদিরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত এবং সংসারী। তুমিও গানেই জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম। তোমার স্বর্গতঃ পিতা তোমাকে লইয়া বড়ো দুর্ভাবনাগ্রস্ত ছিলেন। পরিতাপের বিষয় তোমার এমন প্রতিষ্ঠালাভ তিনি দেখিয়া গেলেন না। তোমার প্রথম রেকর্ড পর্যন্ত তিনি শুনিয়া যান নাই। যাহা হউক, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এখন তোমাকে সংসারী দেখিয়া আমি নিশ্চিন্তে চক্ষু বুজিতে চাই। শেফালি নামে যে মেয়েটি আজকাল খুব নাম করিয়াছে....হ্যাঁ, মেয়েটি সুগায়িকা, তার গান শুনিয়াছি... তোমার চিঠিতে তাহার সহিত তোমার নিয়মিত যোগাযোগের প্রায়শ উল্লেখ দেখি। লিখিয়াছ মেয়েটি বড়ো ঘরের। ' চৌধুরী' বা 'রায়চৌধুরী' সব জাতই হইতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গীয়, কাজেই বৈদ্য হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। যাহা হউক আমি মনস্থির করিয়াছি যদি তাহার প্রতি তোমার অন্তরের টান থাকে, যেমন আমার মনে হইতেছে, তাহা হইলে আমি তোমাদের সম্পর্কে আপত্তি করিব না।

ইতি, আশীর্বাদিকা মা'

অমল চিঠির উত্তর দেয়নি। উত্তর দেওয়ার কিছু নেই। তবে যত্ন করে আলমারির ড্রয়ারে রেখে দেয়। তারপর শেফালির জন্য নতুন গানে সুর দিতে বসে।

এর মধ্যে আরও কত কী ঘটে যাচ্ছে। একদিন কথায় কথায় নজরুল জানালেন ঢাকা থেকে এক মহিলা সমানে পত্রাঘাত করে যাচ্ছেন, নিজের মেয়ের গান তাঁকে শোনাতে তিনি কলকাতায় আসবেন। পদ্মার ওপারের লোকদের হুট করে এসে সংগীত চর্চায় নজরুল সময় দিতে নারাজ। 'মনে আছে অমল, শচীন দেবকে নিয়ে কী ঝামেলা হয়েছিল?'

মনে নেই আবার। এত বড়ো একজন শিল্পী, লোকসংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়ক, প্রাইজ পাওয়া, তাঁর কিনা নজরুলের 'চোখ গেলো চোখ গেলো' গান রেকর্ড করতে সমানে রিকেট চলল। উফ্ এত বার, অমল গুনতে পারেনি। শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত টেকনিশিয়ান বলে ফেলে, 'কাজীদা আর কতক্ষণ?'

এক ধমক লাগিয়েছিলেন নজরুল, দাঁড়া, আগে বাঙালকে বাংলা শেখাই।'

অমল সেদিনের কথা মনে করে হাসি চেপে বলে, 'কিন্তু কাজীদা আমিও তো বাঙাল।'

তোর কথা আলাদা। তুই তো বাংলা কেন, হিন্দি, উর্দু সব জলভাত করে ফেলেছিস। কবে শুনব তুই তামিল গানে সুর দিচ্ছিস। সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর বরপুত্র তুই। তোর সঙ্গে কারও তুলনা হয় নাকি। চিঠিটা পড়।

পড়ে। আড়ষ্ট কেতাদুরস্ত ভাষায় লেখা।

'পত্রলেখিকা খানদানি ঘরের, দেখুন চিঠিটা তাঁদের মুনিম জাতীয় কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। তবে পূর্ববঙ্গের একটি মুসলমান মেয়ে গান গাইছে, অভূতপূর্ব ব্যাপার, না?'

'সে তো বটেই। উত্তর প্রদেশে বেগম আখতার গজল গেয়ে কী নাম করেছে দেখছিস। মেগাফোন রেকর্ড বের করেছে। পাঞ্জাব থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে নুরজাহান কলকাতায় এসে ওস্তাদের কাছে তালিম নিচ্ছে। আর বাঙ্গলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ উঠবে না? সেই জন্যেই তো ভাবছি। দেখা করি, কী বলিস?'

যথাসময়ে মাতা ও কন্যা উপস্থিত। ঢাকার এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের বধূ, জাহানারা খাতুন, পরিবারের পুরুষদের মতো সংগীত প্রেমী। শৈশব থেকে পর্দার মধ্যেই ওস্তাদের কাছে নিজে সঙ্গে বসে মেয়েকে রেওয়াজ করান। তবে তাঁর রুচি চিরাচরিত খানদানি ঘরানার ব্যতিক্রমী, শুধু কালোয়াতিতে মন ভরে না। নব্য ধারার সংগীত তাঁর মন টানে। সখেদে মেয়েকে সমানে বলেন, 'ঢাকার ওস্তাদজীদের দিয়ে হবে না। এঁরা বাংলা গান জানেন না। কলকাতা হচ্ছে বাংলা গানের জায়গা। নতুন নতুন গীতিকার সুরকার সকলেই হিন্দু। মুসলমানদের মধ্যে এক মাত্র নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনিও পশ্চিমবঙ্গের।

তাই সকন্যা কলকাতায় আগমন। পূর্ববঙ্গের অনেক জমিদার বা সচ্ছল গৃহস্থের মতো তাঁদের পরিবারেরও কলকাতায় একটি বাড়ি আছে। সেখানেই ওঠেন। সকন্যা কাজী সাহেবের সঙ্গে

হা হা দিলখোলা হাসি হাসেন নজরুল, 'অমল, দেখ তোমার কত কম বয়সি ভক্ত জুটে গেছে।'

অমল একটু অপ্রতিভ, যদিও গানের জগতে এসে মহিলাদের সঙ্গে আলাপে পূর্ববঙ্গের মফস্‌সল থেকে সদ্য আগত মতো সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা তার আর নেই। কিন্তু এইটুকু মেয়ে হলে কী হবে, এখনই এক ব্যক্তিত্ব, সাধারণের ব্যতিক্রম। সুশ্রী চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ, ছিপছিপে লম্বা গড়ন, গৌরবর্ণ, ডিম্বাকৃতি মুখের ডৌল, একটু বেশি লম্বা নাক, একটু বেশি চওড়া কপাল, পাতলা ওষ্ঠাধর। কী অদ্ভুত তার চোখ দুটি, সরু সরু টানা টানা। তলার দিকটা একেবারে সরল রেখা, ওপরে চোখের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, যেন বাঁকা তলোয়ার। সবচেয়ে আশ্চর্য, মণিদুটো। কেমন ঘন কালচে সবুজ নাকি ছাইছাই। এমন চোখ অমল কখনো দেখেছে কি? ছোটোবেলায় অসমে মেজো পিসির কাছে চাবাগানে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিল বড়ো কী একটা গাছের নীচু ডালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা লম্বা সাপ, সরু মুখটা বাড়ানো, জিভটা হিস্ হিস্ করছে, সামনে একটা পোকা, তার শিকার হতে যাচ্ছে। সেই সাপটার চোখ দুটো যেন ছিল এমনই কালচে সবুজ ছাইছাই। পরক্ষণেই তার মনে হলো, ছি ছি, এতটুকু মেয়ের সম্পর্কে কী যা তা ভাবছে। এ তো প্রায় শিশু।

'কলকাতায় আমাদের একটা বাসা আছে। নানা কাজে পুরুষরা

সাক্ষাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। অভিজাত ঘরের মুসলমান মহিলা হয়ে তাঁর এত দূর রাস্তা পেরিয়ে সেই ঢাকা থেকে আসার সাহস ও প্রগতিশীলতার প্রশংসা করেন নজরুল। যথাবিহিত আলাপ পরিচয়ের পর শুনলেন তাঁর কন্যার সংগীত চর্চার কথা।

'কত বয়স আপনার মেয়ের?'

'ন' বছর পুরো হয়েছে।'

'বড্ড কম বয়স, এখন জনসমক্ষে আসার সময় হয়নি। আরও ক' বছর যাক। এত তাড়া কীসের।

যথারীতি অমলও রয়েছে সেখানে। নজরুল আলাপ করান, এ হচ্ছে অমল সেনগুপ্ত, এইচএমভি'র উঠতি তারকা—'মেয়েটি তাঁর কথার মধ্যেই বলে ওঠে 'আমি ওঁর সব গান জানি।'

কলকাতায় আসেন। আমরা মেয়েরাও হগ মার্কেটে, হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসনে কেনাকাটা করতে চলে আসি। কলকাতার মতো বাজারদোকান আর কোথায় বলেন। এবার থেকে এলেই কিন্তু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করব, ওর কতদূর উন্নতি হচ্ছে আপনার চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে?' আদুরে ভঙ্গি জাহানারা খাতুনের, পুরুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য।

মৃদু হেসে নজরুল বলেন, 'বেশ তো। তবে আপনার মেয়ে কেমন গায় আমি জানিই না। ওর উন্নতি বুঝব কী করে।

তৎক্ষণাৎ মেয়েটি বলে, 'একটা গান করি?'

প্যাঁচে পড়ে নজরুল বলতে বাধ্য হন, 'বেশ তো কর।'

আশ্চর্য, মেয়েটি ধরল শেফালির সেই প্রথম হিট গান, 'জানি জানি তুমি আসিবে না। কচি গলা, কিন্তু কী বলিষ্ঠ আর কী অনায়াস দক্ষতা। সকলে বিস্মিত। নজরুল বলেন 'বাঃ, সুন্দর

গেয়েছ। ক’বছরেই পাকা গায়িকা হয়ে যাবে। ভালো কথা, তোমার নাম কী?’

‘মালিকা খাতুন।’

‘মালিকা! বাপরে একেবারে রানি!’

জাহানারা হাসিমুখে বলেন, ‘জী। যেখানেই থাক, মেয়ে আমার যেন রানির মতো সবার ওপরে রাজত্ব করে।’

‘নিশ্চয় করবে। আপনার মেয়ের যেমন রূপ তেমন গুণ।’

প্রথম আলাপের পর থেকে বছরে একবার তো বটেই, কখনো কখনো তার বেশি বার মাতা-কন্যা হাজির নজরুলসকাশে। প্রতিবার শেফালির কোনো হিট গান গায়। শেষ করে প্রত্যাশাভরা মুখে তাকায় যেন শেফালির সঙ্গে সে যে সমান পাল্লা দিতে পেরেছে কেউ স্বীকার করুক। কেমন অস্বস্তি লাগে অমলের। নিজেকে বোঝায় শেফালি এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা, তার রেকর্ড করা গান গলায় তোলা নতুনদের পক্ষে স্বাভাবিক। বছর কয়েক যেতে না যেতে কলকাতায় এলেই ‘তোমার এই খেলাঘর’ বা ‘শুধু তুমি আর আমি’র মতো অমল ও শেফালির কোনো হিট প্রেমের গান ধরে মালিকা। আগে আবার বলে নে, ‘এটা তো ডুয়েট, অমলবাবুও সঙ্গে গাইতে পারেন।’ নজরুল হাসেন, অমল চুপ করে থাকে, গলা মেলায় না।

।। তিন ।।

শেফালি মালিকা বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। তার কথা ভেবে অমলের বুকটা টনটন করে। এ ক’বছরে তারও ব্যস্ততা, খাটুনি বহুগুণ বেড়ে গেছে। বম্বের হিন্দি ছায়াছবির জগৎ সর্বদা খোঁজ রাখে কলকাতায় কে কীসে উঠল। অমনি তার সাদর আমন্ত্রণ বম্বেতে। শেফালি অমল দুজনেই আমন্ত্রিত, বম্বে কলকাতা করে। আরম্ভটা অদ্ভুত। এক রাত্রে হঠাৎ বম্বে থেকে ট্রাংককল, বিখ্যাত ডিরেক্টর ডি রাজারাম কথা বলছেন।

‘অমলবাবু, নমস্তে। আপনি তো কলকাত্তার মশুর কলাকার আউর মিউজিক ডিরেক্টর হ্যাঁয়। মেরা ফিল্ম মেঁ শেফালি চৌধুরী গানা গানে রাজি। লেকিন উনকি এক সর্ত হ্যাঁয়, খালি আপ মিউজিক দেনেসে উও গায়েঙ্গি। আপ প্লিজ এগ্রি কিজিয়ে—

অমল একসঙ্গে বিস্মিত ও পুলকিত। পরদিনই শেফালির সঙ্গে তার দেখা, ‘কবে তুমি আসিবে’ আর ‘আকাশে আজ রামধনু’ রেকর্ডিং ছিল। সেই সাদা পরিচিত মূর্তি, সরুপাড় সাদা শাড়ি, কনুই হাতা সাদা গলাবন্ধ ব্লাউজ, এক বেণী, মেকআপহীন মুখ, সংসংকোচ বিনীত ভঙ্গি। কে বলবে একজন তারকা। রেকডিঙের পর শেফালি চলে যাচ্ছে, অমল বাধা দেয়, ‘এক মিনিট, একটু বসো, কথা আছে।’ শেফালি বসে।

‘তুমি বম্বের রাজারামের বইতে গান গাইতে রাজি হয়েছ?’ শেফালি তেমন আনত মুখে মাথা হেলায়, হ্যাঁ।

অমল একটু চুপ করে থেকে বলে, ‘গতকাল রাজারাম আমাকে ফোন করেছিলেন। তুমি নাকি আমি সুর না দিলে গাইবে না শর্ত দিয়েছ।

শেফালি আনত মুখেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। ‘দেখ, তুমি তো এখন আর নতুন গাইয়ে নও, যথেষ্ট অভিজ্ঞ এ লাইনে। অন্য সুরকার, আর পাঁচজন মিউজিক ডিরেক্টরদের সঙ্গে কাজ করবে। সেটাই স্বাভাবিক।

শেফালি চুপ। অমল বহু কষ্টে প্রায় জোর করেই প্রশ্ন করে, ‘কেন শুধু আমার সুরে গাইতে চাও?’

দুজনে কতক্ষণ নীরব। আবার অমল বলে, ‘আমি তোমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।’

শেফালি উঠে দাঁড়ায়, ‘আর কারও সুরে আমার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভবপর নয়।’

দ্রুত পদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অমল খানিকক্ষণ বসে থাকে, মনটা তার ভরে গেছে। কত না বলা প্রশ্নের উত্তর মিলে গেল। অতঃপর তার সুরসৃজনে যেন নতুন প্রেরণা। নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন, একটার পর একটা পরীক্ষানিরীক্ষা। একবার তালের বাদ্য বর্জন করে একটি গান সুর দেয়। গ্রামোফোন কোম্পানির ঘোর আপত্তি অগ্রাহ্য করে। শেফালির গাওয়া ‘বল ওগো বল,’ আর ‘কার বাঁশি আমারে ডাকে’, রেকর্ড অল টাইম হিট। অতঃপর তার গলায় হিন্দি, বাংলা, আধুনিক, ফিল্মের গান, ভজন কত রকম সংগীতেই না সুর অমল দিয়েছে, দিয়ে যাচ্ছে।

সারা ভারতের মতো বম্বেতেও এখন বাঙ্গালিদের কদর। কলকাতার পরিচালক হিন্দি সিনেমা পরিচালনা করে, বাঙ্গালি লেখক সিনেমার চিত্রনাট্য লেখে। গত বছরই অমল বম্বেতে এমন একটা হিন্দি ছবির মিউজিক ডিরেক্টর হয়ে দারুণ হিট কয়েকটি গানে সুর দিয়েছে, গেয়েছেও একজন বাঙ্গালি গাইয়ে নায়িকা। গানের সঙ্গে আবহে তার কারখানার হুইসেল ব্যবহার যেমন নাটকীয় তেমনই চমকদার। ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে। মোটকথা বম্বে এখন অমল শেফালির দ্বিতীয় সংসার। তবে শেফালির সঙ্গে সম্পর্ক যেখানে ছিল সেখানেই অনড় অটল।

এদিকে অমলের এত ব্যস্ততার মধ্যেও মালিকা কিন্তু তার পরিসর ঠিক আদায় করে নেয়। নিয়মিত কলকাতা আসা, গান শোনানো যেন রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আর ন’ বছরের বালিকা নেই। ক্রমে হয়ে উঠেছে একটি সুশ্রী সুকণ্ঠী কিশোরী। সপ্রতিভ। কাজীসাহেব ও অমলকে এখনো সেই শেফালির কোনো জনপ্রিয় রেকর্ড গেয়ে শোনাবেই।

কিছুদিন হলো নজরুলের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, কেমন প্রায়শ অন্যমনস্ক থাকেন, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন। তাঁর কাজের দায়িত্ব ক্রমে পুরোটাই প্রায় অমলের ঘাড়ে এসে

পড়েছে। কাজীদার প্রতি তার ভালোবাসা ভক্তি অসীম, হাসিমুখে বাড়তি কাজ করে যায়। ঘুমের সময় এখন মোটামুটি মেরেকেটে ঘণ্টা পাঁচেক। তাতে কিন্তু ক্লান্তি নেই। সৃজনের অফুরন্ত শক্তি তার মধ্যে, গান আর গান, সুর দেওয়া, কখনো নিজেও গান গাওয়া। এমনও হয় এক দিনে ৩০টা গানে সুর দিয়েছে। একটা নিজস্ব পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত স্বরলিপি বের করেছে, সুর দিয়ে তৎক্ষণাৎ লিখে রাখতে পারে।

জাহানারা খাতুন ধরে পড়েন, এবারে মালিকার একটা রেকর্ড করিয়ে দিতেই হবে। কত বয়স হলো মালিকার? তেরো পূর্ণ?

অমলের মনে পড়ে যায়, শেফালির প্রথম রেকর্ড ১৪ বছর বয়সে। মালিকাকে যেন তার সঙ্গে টেক্কা দিতে হবে। হঠাৎ অমলের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি আসে।

'মালিকা তো সব সময় শেফালি চৌধুরীর গান গায়, তা শেফালি আজকাল মীরার ভজনে খুব নাম করেছে। স্বয়ং গান্ধীজী ওর প্রশংসা করেছেন শুনেছেন তো। মালিকা কি মীরা বা সুরদাসের ভজন গাইবে?'

মা ও মেয়ে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'না, না, ভজন গাইবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা মুসলমান।'

'গানের আবার ধর্ম কী? গওহর জান তো মুসলমান হয়েও কীর্তন শিখেছিলেন, ভজন গেয়েছেন।'

'অমলবাবু, কিছু মনে করবেন না, গওহর জানের সঙ্গে আমাদের খানদানের মেয়ের তুলনা কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না। আপনি কি জানেন না গওহর জান আসলে ছিল মেম, তার বাপ দাদা সব খাঁটি সাহেব, মা-টা ছিল অ্যাংলো, সাহেব তালাক দেওয়ায় বাধ্য হয়ে এক রহিস মুসলমানকে ধরে, নিজে মুসলমান হয়, মেয়েকে মুসলমান করে। মা মেয়ে দুজনেই তো তাওয়াইফ মানে আপনারা যাকে বলেন বাইজি, তাই ছিল।'

'গওহর আমাদের এখানে প্রথম রেকর্ড করেন, বহু ভাষায় গান গেয়েছেন, হিন্দুস্তানি হালকা ক্লাসিকাল তিনি সারা দেশে পপুলারাইজ করেন, গ্রেট আর্টিস্ট।'

'সে সবে আমাদের কোনো মতলব নেই। ওসব ভজন কী ফিল্মটিল্ম কিচ্ছু চলবে না। মালিকা স্রেফ কাজী সাহেবের গান করবে।

অমল মনে মনে প্রশ্ন করে, কাজী সাহেবের কালী কীর্তনগুলো করবে তো? মুখে বলে 'তথাস্তু।' যে যা চায়। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যথাসময়ে মালিকার রেকর্ড বেরল, নজরুল গীতির সমঝদারের বৃত্তে সমাদৃত, তবে শেফালির গানের মতো আমজনতার কাছে হিট নয়।

।। চার।।

কলকাতায় কেন জানি না অমলের আর ভালো লাগছে না। যুদ্ধ লাগতে না লাগতে ভাইপো ভাগ্নেদের কলকাতা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। লোকজনের মধ্যে কেমন একটা চাপা অসন্তোষ, দেখ না দেখ লোক তেরিয়া হয়ে উঠেছে। হাতাহাতি হলো বলে! মনোজ অ্যান্ড কোম্পানি যুদ্ধসংক্রান্ত নানা নতুন কাজকর্মে ব্যস্ত। রেশানের দাপটে অন্নবস্ত্রে টানাটানি, লাইন দিয়ে এনার্জি আর সময়ের অপব্যয়, একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দুর্লভ, অন্যদিকে কালোবাজারিতে টাকা উড়ছে, রাস্তায় ঘাটে ব্ল্যাক আউটের কল্যাণে সাধারণের চলাফেরা খুব সীমিত—সব মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহাসংঘর্ষে কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। শহরের মানুষজন আগের মতো খাওয়া-পরার বাইরে আর পাঁচটা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানোর স্বভাবটা হারিয়ে ফেলেছে। অথচ যুদ্ধ সত্ত্বেও বম্বেতে তো ফিল্মের কাজকর্ম দিব্যি চলছে। এই তো শচীন দেব বর্মন বাঙ্গলায় তেমন সুবিধা করতে না পেরে সেখানে গিয়ে ভালো চান্স পেয়ে গেছেন। অমল কলকাতার সংসার তুলে দিয়ে বম্বে চলে যায়। বাড়িটা রেখে দেয় দারোয়ানের জিম্মায়, মাঝে মাঝে তো তাকে বাংলা রেকডিং-এর জন্য আসতে হবে।

তার আগে টাকা পয়সার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক

*With Best Compliments*

*from -*

**A**

**Well Wisher**

বছর ধরে মা ও দাদারা বার বার বলে আসছেন, সব টাকা যেন সিন্দুকে না রাখে। বাড়িতে তার তো নিজের বলতে কেউ নেই। কাজের লোকের ওপর এত ভরসা রাখা সুবিবেচনার কাজ নয়। আজকাল সবাই ব্যাংকে টাকা রাখে। ইংরেজের ব্যাংকে নয়, আমাদের নিজেদের লোকেরাই কত ব্যাংক খুলেছে। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা, সিলেট এমনকী নোয়াখালির টাকাওয়ালা জমিদার, ব্যবসায়ী মাত্রেই একটা ব্যাংক খুলে ফেলেছে। এই তো 'সোনার বাংলা' ব্যাংক কেমন রম রম করে চলছে, খুলনা যশোরেই ১৩ টা ব্রাঞ্চ, জেলা থেকে শুরু করে এখন কলকাতায় হেড অফিস। অমল অনেক ইতস্তত করে কিছু টাকা রেখেছিল। সুদ ভালোই পেয়েছে। কলকাতার বাস উঠিয়ে নেবার সময় সিন্দুক খালি করে সব টাকা সোনার বাংলা ব্যাংকে জমা করে দেয়।

ব্যাংকের ম্যানেজার মিহির মিত্তির বলেন, 'নিশ্চিন্তে বম্বে চলে যান আমরা আপনার টাকা শুধু পাহারা দেব তাই নয়, কত সুদ পাবেন দেখবেন। আপনার মতো সফল বাঙ্গালি, আমাদের কাস্টমার, এতো ব্যাংকের গৌরব। বুইক গাড়িটাও তো নিয়ে যাবেন বম্বেতে? ভেরি গুড। টাকা কত লোকের আছে, নজর আপনার মতো উঁচু ক' জনের। মাড়োয়ারিদের দেখুন, না। সেই আদ্দিকালের ঢঙ্গে গদিতে বসছে, বড়বাজারে থাকছে, রিকশয় যাতায়াত, সিন্দুকে টাকা লুকনো। আর আপনি একা মানুষ কী ঠাঁটবাটে থাকেন, ৩০ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্সই দিয়েছেন। সব শোনা স্যার, খবর ছড়িয়ে যায়।

টুং করে বেল টিপে, 'ওরে বংশী চা নিয়ে আয়', হুকুম করতে করতে 'না না থাক, আজ আমার তাড়া আছে,' বলে অমল বিদায় নেয়।

বম্বেতে এসে নতুন উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হিন্দি ফিল্ম আর এক আশ্চর্য দুনিয়া। ছত্রিশ জাতের মেলা। ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা ঢালে পারসি প্রডিউসার, গান ও চিত্রনাট্য লেখে উত্তরপ্রদেশের মুলসমান, সুর দেয় বাঙ্গালি, পরিচালনায় মারাঠি বা পাঞ্জাবি। কত জাতির মিলিত অবদানে বম্বের ফিল্ম দুনিয়া গড়ে উঠছে। এই বিরাট দেশের সব কোণ থেকে সেরা প্রতিভাকে আকর্ষণ করছে। কেমন করেছে হলিউড, সারা পশ্চিমি দুনিয়ার নারী-পুরুষের মিলিত প্রয়াসে এত বড়ো ইন্ডাস্ট্রি। তাই এমন অপ্রতিরোধ্য তার আকর্ষণ আর জনপ্রিয়তা। ইংরেজরা বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য করেছে বটে কিন্তু ফিল্মে হলিউডের ধারে কাছে লাগে না। ভারতের হলিউড হতে চলেছে বম্বের ফিল্ম। অমল এখন তার শরিক।

শেফালিও প্রায়শ এখানে, সঙ্গে রাঙা পিসি, লতায় পাতায় সম্পর্ক, কলকাতায় তাদের বাড়িতেই আশ্রিতা বিধবা। বাতের ব্যথায় কাতর মায়ের পক্ষে আর যাতায়াত শরীর নেয় না। ইনি একেবারেই নির্বিরোধী, ঘরের কাজকর্ম করেন, শেফালি বেরোলে সঙ্গে থাকেন। মুশকিল হলো সমানে ভক্তিমূলক, 'ম্যায়নে চাকর রাখো জি' টাইপের ভজন গেয়ে গেয়ে পাবলিকের যেন কেমন কেমন লাগে। বিরক্ত অমল বোঝায়, 'তুমি হচ্ছ শিল্পী, প্রেমের গানে প্রেমিকা, ভক্তির গানে ভক্ত, স্বদেশী গানে স্বদেশী। কোনও ভাষা কী কোনও ভাব তোমার লেবেল হবে কেন? একটাই পরিচয়, কণ্ঠশিল্পী, ব্যাস।'

সে নিজে কেমন। কত ধরনের গানে সুর দিয়েছে, স্বদেশী গানে, বিপ্লবীদের গানে, প্রেম-বিরহ-মিলনে যেমন আছে তেমন ভক্তি গীতিতে। আর বাঙ্গালি অবাঙ্গালি ভেদ তো ভুলেই গেছে। অবাঙ্গালি গায়ক বাদক নিয়ে কত রকম কাজ করে যাচ্ছে। এমন দিন হয় যে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত একটিও বাংলা কথা বলার সুযোগ পায় না। কোনো অসুবিধা বোধ করে না। তার কাছে হিন্দি উর্দু বাংলা সব সমান, সে সুরকার। হ্যাঁ, শেফালি এবার তামিল ফিল্মে গান গাইছে, সুর কে দেবে? কেন, অমল সেনগুপ্ত।

কাজীদার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলে গেল। কিন্তু তিনি বেঁচে থেকেও নেই। অমলের মনটা ভার হয়ে যায়, সত্যি কথা বলতে কী, কলকাতায় যে তার মন টিকল না, তার অন্যতম কারণ কাজীদার এই মারাত্মক রোগ। তিনি তার জীবনে বাবার চেয়ে বেশি তো কম নন। উত্তরাধিকারী পুত্রের মতো সে সযত্নে তাঁর সংগীতে সুর দেয়, তাঁর লেখা সব গানের হদিশ রাখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। বম্বেতে আজ অমলের প্রতিষ্ঠালাভে যিনি সবচেয়ে খুশি হতেন তিনি আজ বধির। গানের জলসায় কবি নিজেই নীরব।

তবে একজন তার সাফল্যের উঠতি গ্রাফে নিয়মিত খেয়াল রেখে যাচ্ছে, মালিকা খাতুন। বম্বে আসার আগে থেকেই জাহানারা খাতুন সকন্যা তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিলেন—'পার্ক সার্কাস থেকে হাজরায় আপনার বাড়ি দমদমে গ্রামোফোন কোম্পানির স্টুডিয়ো থেকে অনেক কাছে। এখানে আসা সুবিধা। তাছাড়া আপনি একলা থাকেন, যত্ন করার কেউ নেই। একটু রেজালা বানিয়ে এনেছি, ওখানে ঢাকার নামকরা পদ, আর ঢাকাই পরোটা। খাবেন কিন্তু।'

বম্বের ঠিকানায় নিয়মিত মালিকার চিঠি আসে, যদিও অমলের উত্তর দেওয়ার সময় নেই। সে দিব্যি একতরফা লিখে চলে। তার সংগীত পরিচালনায় প্রতিটি ফিল্ম, প্রতিটি গানে তার নজর। প্রতিটি কাজের প্রশংসা করতে ভোলে না।

'এত ব্যস্ততার মধ্যে নিশ্চয়ই আমার কথা ভুলে গেছেন? না, ভুললে চলবে না। কবে আসবেন কলকাতায়? এখানে কোনো রেকর্ডিং নেই? অন্তত পুজোর সময় দেশে যাবেন তো? কলকাতা হয়েই যাবেন, না? তখন আমাকে নতুন গানের তালিম দিয়ে যেতে হবে। কবে, কবে আসবেন, অমলবাবু।'

একেবারে রবীন্দ্র সংগীত, 'দিবস রজনি আমি যেন তার আশায় আশায় থাকি।' বা 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'।

কলকাতার কথা ভাবলেই এক প্রতীক্ষারত তরুণীর চেহারা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। লম্বাটে ধাঁচের মুখ, একটু বেশি লম্বা নাক, বেশি চওড়া কপাল, পাতলা ওষ্ঠাধর, আর সেই আশ্চর্য চোখ, তলার দিক লম্বা টানা সরল রেখ, ওপরে এ কোণ থেকে ও কোণ খাপ থেকে খোলা বাঁকা তলোয়ার। ঘন সবুজকালো না ছাইছাই চোখের মণি, ঠিক, ঠিক যেন সেই অসমের গাছে জড়িয়ে থাকা সরু সাপটার চোখ, সবুজকালো ছাই ছাই, এক দৃষ্টে তাকিয়ে, সামনে একটা পোকা। শিকার হাজির।

মাঝে মাঝে অমলের সন্দেহ হয় মেয়েটার বোধহয় একমাত্র কাজ হলো তার প্রতি নজর রাখা। কিন্তু কেন। এখন সে তরুণী, তার বিয়ে শাদির ব্যবস্থাই-বা পরিবার করে না কেন কে জানে। চিঠি পড়ার চেয়ে মালিকাকে বেশি সময় অমল দেবে কী করে। তবু দিয়ে ফেলে। বা বলা উচিত মালিকাই আদায় করে নেয়। কলকাতায় যখনই অমল রেকর্ডিং-এর কাজে আসে, মালিকা উপস্থিত। আরও নজরুল গীতি তার তোলা চাই। মাঝে মধ্যে একটা রেকর্ডও করে ফেলে। তার এত ব্যস্ততার মধ্যেও জাহানারার রাঁধা মাটন তেহরি, আর ঢাকা থেকে আনা বাখরখানি খেতে তাদের পার্ক সার্কাসের বাসায় যেতেই হয়। এই প্রথম অমল তাদের বাড়ি এল। মাঝবয়সি থেকে বৃদ্ধ, বেশ ক'জন পুরুষ হাজির, পরনে পাঞ্জাবি পায়জামা, কারও কারও মেহেদি করা চুলদাড়ি, কেন জানি না মনে হলো কেউই বিশেষ কিছু কাজ করে না, এ বাড়িতে থাকাটাই জীবিকা। অমলকে তাদের সকলের সামনে দাঁড় করিয়ে পরিচয়, 'ইনি হচ্ছেন মালিকার ওস্তাদজী,' ব্যস। তাকে একলা বসিয়ে সাধাসাধি করে খাওয়ান, যেন জামাই আপ্যায়ন হচ্ছে।

মেহমানগিরির বাহুল্যে একটু অপ্রস্তুত অমল। মালিকার জীবনে এত কী ভূমিকা অমলের যে এমন খাতিরদারি। তার গায়িকা হওয়া, বা বলা উচিত নজরুল গীতির শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্যই কি অমলকে এত প্রয়োজন? বাঙ্গলায় কাজীদার গান আরও অনেকে গেয়ে নাম করেছেন, অমলই তাদের কতজনের রেকর্ড করিয়েছে। মালিকা আদৌ প্রথম নয়। হয়তো ঢাকার সেই মোগল জমানার রেশ মিলিয়ে যাওয়া অবক্ষয়ী দুনিয়ায় একটি ভদ্র ঘরের মেয়ের পা রাখাই দুঃসাধ্য। তাই কি অমলকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে। সে অমুক 'জান' কী তমুক 'বাই' নয়, খানদানি ঘরের মেয়ে। তাকে আধুনিক শিল্পী হতে হবে, সেই জ্ঞান হওয়া থেকে জাহানারা কানে মন্ত্র দিয়ে আসছেন। আর তার জন্য চাই ঠিকঠাক তালিম, এক উপযুক্ত ওস্তাদ এবং সে ওস্তাদ এখন আর অমুক খাঁ তমুখ খাঁ নয়, একজন হিন্দু। যে গান সে করতে চায়, বাঙ্গলার যে জগতে তার প্রতিষ্ঠা কাম্য, সেখানে সবাই হিন্দু। অমল সেনগুপ্ত কি তাহলে মালিকার নিয়তি! এত কথা কেউ কাউকে বলেনি। কিন্তু আজকাল মাতা-কন্যার সান্নিধ্যে এলেই অব্যক্ত একটা চাপ অনুভব করে। বম্বে পৌঁছে কেজো আবহাওয়ায় ফিরে যেন স্বস্তি। তখন মালিকা সম্পূর্ণ বিস্মৃত—যতদিন না পরের পত্রদূত হাজির হয়।

বম্বেতে শুধু মালিকা বিস্মৃত নয়, বিস্মৃত বাঙ্গলার ক্রমবিষাক্ত আবহাওয়া, '৪৬ সালের নির্বাচনে বাঙ্গলার মুসলমানদের মুসলিম লিগকে ঢেলে ভোটদান, তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং হিন্দু নরসংহার, কলকাতার ভয়ংকর অবস্থা, বাঙ্গালির করা প্রথম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ধর্মতলায় কমলালয় পুড়ে ছাই, অনন্য ইম্প্রেসারিও যিনি উদয়শঙ্করকে মঞ্চে উপস্থিত করেছিলেন সেই হরেন ঘোষকে মেরে তার দেহ টুকরো করে একটা সুটকেসে ভরে ফেলে দেওয়া হলো। ১০ হাজার লোক নাকি খুন। সেনগুপ্ত পরিবার জামশেদপুর ও খুলনায় ভীত উদ্বিগ্ন, কিন্তু সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নয়। একমাত্র অমলের ছোড়দা মুর্শিদাবাদে পোস্টেড এবং ঝাঁজটা বিলক্ষণ টের পেল। তখন এমন পরিস্থিতি যে ট্রাংককল পাওয়া শক্ত। বড়দার কাছ থেকে কেনোক্রমে সকলের কুশল সংবাদ পায় অমল। তারপর চিঠিতে বিস্তারিত, মুর্শিদাবাদে ১৫আগস্ট কেমন নবাব বাড়ি থেকে সর্বত্র পাকিস্তানের পতাকা উড়ছিল, খুলনায় ভারতের। ১৭ আগস্ট সব উলটে গেল। মুসলিম মেজরিটি মুর্শিদাবাদ মালদা দেখা গেল ভারতে, আর তার বদলে হিন্দু মেজরিটি খুলনা গেল পাকিস্তানে, বৌদ্ধ চট্টগ্রামও।

সেনগুপ্ত পরিবারের মাথায় বজ্রাঘাত। খুলনার ভিটেমাটি বাড়িঘর সবচেয়ে বড়ো কথা মায়ের নিরাপত্তার কী হবে। এমনিতেই বম্বে আসার পর থেকে পূজাতে দেশে যাওয়ার আর সম্ভব হতো না, মহারাষ্ট্রে তো দুর্গাপূজার কালচার নেই, ওখানে গণেশ চতুর্থী প্রধান উৎসব। বরং ভাইফোঁটায় দীপাবলির অবকাশে জামশেদপুর দু'তিন বার ঘুরে এসেছে, দাদা-দিদি, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে- ভাগ্নির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে হয়নি। মা কখনো নালিশ করেন না। তাই আরও অপরাধবোধে বিদ্ধ। পার্টিশানের পরে অমল দাদাদের বলল, 'ভাবছি পূর্ববঙ্গে গিয়ে মাকে নিয়ে আসি আমার কাছে।' সকলেই হাঁ হাঁ করে উঠে। 'বিয়েথা তো করিসনি, নিজের চালচুলো নেই, তার মধ্যে মাকে এনে কী করবি?'

দিদি আবার যোগ করে, 'মা বিয়ে হওয়া থেকে সারা জীবন খুলনায়। এত বছরে মাত্র একবার বেরিয়েছেন, আমার শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর যখন তাতাই হলো, তখন আমার কাছে ক'মাস থেকেছিলেন। সেই একবারই মা দেশ ছেড়েছেন। এখন শেষ বয়সে মায়ের পক্ষে বম্বেতে নতুন করে তোর সংসার করা সম্ভব? আমরা বরং দেখব।'

কারও দেখাদেখির প্রস্তাব মা শুনলেন না। 'আমি সারা জীবন যেখানে থাকিয়াছি বাকি দিনগুলি সেখানেই থাকিতে মনস্থ করিয়াছি। স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া আমার একমাত্র যাইবার

স্থান শ্মশান। একটা পার্টিশান না কী হইয়াছে বলিয়া রাতারাতি পৃথিবী তো বদলায় নাই। আমাকে লইয়া তোমরা অনর্থক চিন্তা করিও না। তবে পিতৃপুরুষের সম্পত্তি সবই হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তোমাদের হাজারবার বলিয়াছিলাম গ্রামের জমিজমা ঘরদুয়ারের মায়া না করিয়া বিক্রিবাটা করিয়া যে যেখানে আছ বাড়িঘর বানাইতে লাগাইয়া দাও। তুমি আর ইন্দিরা তবু জামশেদপুরে বাড়ি করিয়াছ, কৃষ্ণ দক্ষিণ কলিকাতায় জমি কিনিয়াছে। এক অমুর কিছুই নাই। তার কবে থইথান হইবে জানি না। আমি বাঁচিয়া থাকিতে বোধ হয় দেখিতে পাইব না। তোমরা তিনজন ছোটো ভাইটিকে একটু দেখিও, জলে ভাসাইয়া দিও না। ইতি, আশীর্বাদিকা মা।'

বড়দা ট্রাংককলেই গড়গড় করে পড়ে গেলেন।

যাক, অমলের মায়ের জন্য কিছু করার দরকার রইল না। তবে ধন্য ইংরেজ বাহাদুরের প্রশাসন। এত ডামাডোলের মধ্যেও ডাক বিভাগ মোটামুটি কাজ করে গেছে। মালিকার চিঠি ঠিক হাজির। কী উল্লাস পাকিস্তান হাসিলে সারা ঢাকা শহরে। মহল্লায় মহল্লায় রোশনাই, মিষ্টি বিতরণ। তাদের বাড়ি 'শাহী মঞ্জিলে' তো বটেই। কর্তা থেকে নফরচাকর, সব মুসলিম লিগ সমর্থক। সকলে খুশি। একটাই দুঃখ, কলকাতা হাসিল করা গেল না, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্থানে রইল। তবে কে না জানে পরে পাকিস্তানে সব এসে যাবে, ইনশাল্লা। এই প্রথম মালিকার মুখে আল্লার উল্লেখ শুনল, তার থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে বসে।

।। পাঁচ ।।

অমল সব পড়ে, চিঠি, খবরের কাগজ। ফোনে শোনে খবরাখবর। তবু পুরনো অভ্যাস যায় না, সেই ছোটোবেলার মতো নিজের মধ্যেই আবার ডুবে যায়, বাইরের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তার কাছে সব কেমন অবাস্তব। যেন এত সব কাণ্ডকারখানার সঙ্গে সে আদৌ যুক্ত নয়। ১৯৪৬-৪৭ সাল সে বাঙ্গলার বাইরে, বাঙ্গালির জাতীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা তার সত্তাকে বিদীর্ণ করল, সে অভিজ্ঞতা অমলের কতটুকু। তার বোধে দেশভাগ শুধু কাগজে-কলমের একটা ঘটনা। বিহারি মুসলমানরা উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরত মুসলমান বেকার আর মস্তানদের সঙ্গে জুটে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দুদের পেটাতে লাগল, যখন কমিউনিস্ট খেদানোর নামে নমশূদ্রদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল, সে সব খবরও অমলের বিশেষ গায়ে লাগেনি। কেন কে জানে তার বোধে বাস্তব রয়েছে। সেই ১৯৩৫ সালের কলকাতায় যখন বড়ুয়া সাহেবের 'দেবদাস' মুক্তি পেয়েছিল।

তবে চোখের সামনেই না দেখে পারে না বম্বের ফিল্ম দুনিয়া এক জায়গায় নেই। বিশাল ভারতে কত প্রতিভা ছড়িয়ে আছে। 'মহল' ছবিতে রাজপুতানার খেমচাঁদ প্রকাশের সুরে 'আয়েগা আনেওয়ালা'র মতো হিট একটা গানই দিল্লির অভিনেত্রী মধুবালা এবং মহারাষ্ট্রের গায়িকা লতা মঙ্গেশকরকে দাঁড় করিয়ে দিল। দুটি তারকার জন্ম। একখানা ফিল্ম 'বরসাত' করেই মাতিয়ে দিয়েছে হায়দরাবাদের শঙ্কর আর গুজরাটের জয়কিযেন—যুগল সুরকার। কোন মন্ত্রবলে এই জুটি যেন ভারতের সাধারণ মানুষের অনুভূতি, মানসিকতা, চাহিদা বুঝে সুর দেয় আর পর পর হিট। তার মধ্যে বাঙ্গলার শচীন দেব বর্মন দিব্যি জায়গা করে নিয়েছেন, তাঁর সুরে বাঙ্গালি গায়িকা গীতা রায়ের গান হিট, পর পর হেমন্তের গলায় 'ইয়ে রাত হ্যাঁয় চাঁদনী, তুম কাহাঁ,' সুপার হিট। হিন্দি ফিল্ম দুনিয়ায় ট্যালেন্টের বন্যা। অমল সেনগুপ্ত কি এই জোয়ারের টানে এগোতে পারছে?

একদিন রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে হলো, রাস্তায় একটা রেডিয়ো গ্রামোফোনের দোকানে ঢোকে। 'রেকর্ড রাখতে হ্যাঁয়?''

'জরুর। কিসকো গানা চাহিয়ে?'

'আচ্ছা, অমল সেনগুপ্ত কা কোই রেকর্ড হ্যাঁয়? মতলব উন কা কম্পোজিশান?'

দোকানদার ভুরু কোঁচকায়, 'সমঝা নেহি। কম্পোজিশান মতলব? গানা গায়া কৌন বাতাইয়ে। আর্টিস্ট কা নাম। সেফালি চৌধুরী, বনানী দেবী? হাঁ হ্যাঁয়।'

চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজের সুর দেওয়া বনানী দেবীর হিট গান একটা কেনে। 'বহোত সুক্রিয়া।'

বেরিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে খানিকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে বেরায়। এত পুরুষ চারিদিকে, প্রত্যেকে উদয়াস্ত খাটছে পরিবার প্রতিপালনের জন্য। স্ত্রীর দায়িত্ব, দায়িত্ব তার গর্ভের সন্তানের, উত্তরাধিকারী, তার ধারা বহন করবে। অমল কীসের জন্য এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তার নাম পর্যন্ত প্রায়শ থাকে না। ইন্ডাস্ট্রিতে তাকে এক ডাকে চেনে সত্যি কথা। কিন্তু জনস্মৃতিতে সে কি শূন্য নয়? কর্ম করে যাও, ফলে তোমার অধিকার নেই, মানতে কে পারে! রাতে বহুক্ষণ ঘুম আসে না। পর পর ক'রাত কাটে অস্থিরতায়। দিনেরবেলা কাজে খামতি নেই। শিল্পী সুরকার থেকে যেন সুরের যন্ত্র হয়ে উঠেছে।

আজ শেফালির একটা গান রেকর্ডিং। একটু দেরিতে পৌঁছয়, 'রাঙাপিসির শরীরটা ভালো নেই, কাজের লোকটাকে নিয়ে এসেছি।'

'ওকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

দুজনে এবারে কাজে বসে। অমল খেয়াল করে, আগের মতো একহারা পাতলা আর নেই শেফালি। একটু মেদ জমেছে, তারও তো বয়স এখন তিরিশের কাছাকাছি, অমল তো চল্লিশ

ছুঁই ছুঁই। যৌবন যায়, যৌবন বেদনা যে যায় না। রেকর্ড করা হয়ে গেলে দুজনে স্টুডিয়ো থেকে বের হয়।

'চল না আমার বাড়িতে একটু চা খাবে। হরি বলছিল ভেজিটেবল চপ করবে।'

শেফালি মৃদু হাসে, 'বম্বেতে তো রাঁধুনি ঠাকুর নেই, হরি বেচারা রান্না শিখতে বাধ্য।'

এই প্রথম অমলের গৃহে শেফালি পা রাখল। কলকাতায় তো স্টুডিয়ো একমাত্র দেখাসাক্ষাতের স্থান। হরির চপ ও চায়ের যথা বিহিত সৎকার এবং বাহবা দান। অতঃপর দুজনে একা মুখোমুখি।

'আমাদের সম্পর্ক কত বছর হয়ে গেল, বলো তো?' অমল শুরু করে।

'তা বছর পনেরো ষোলো তো হবে।' দুজনে খানিক ক্ষণ নীরব।

'শত শত গান আমরা একসঙ্গে রেকর্ড করেছি, কী বল?'

'হ্যাঁ, তা তো হবেই।'

'আচ্ছা, শেফালি, গানের বাইরে কি আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই? এত বছরে কি আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হইনি?'

শেফালি নিরুত্তর। আবার সেই সরু পাড় মামুলি সাদা শাড়ির আঁচল হাতে আঙুলের মধ্যে নিয়ে পাকাচ্ছে। সেই চোদ্দ বছরের কিশোরীটির মতো।

'শেফালি, তুমি তো বোঝ আমার মনের কথা, বোঝ না?'

নীরবে শেফালি ঘাড় হেলায়, হ্যাঁ বুঝতে পারি। 'তাহলে আর কতদিন আমরা এভাবে দুজনে পরস্পরের থেকে দূরে দূরে থাকব? আর কেনই-বা থাকছি? চিরকাল এভাবে চলতে পারে না। পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই তো সংসারের টান বেশি বলে জানতাম। তুমি কি স্বামী সন্তান চাও না?'

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ।

'আমি আর এভাবে থাকতে পারছি না, শেফালি। তুমি একটা কিছু জবাব দাও।'

'হিন্দু নারীর দুবার বিয়ে তো হতে পারে না।' আস্তে আস্তে বলে শেফালি, তার মুখে গভীর বিষাদ।

অমল বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হতবাক। তারপর সামলে বলে, মানে? দুবার কার বিয়ে? তোমার? তুমি বিবাহিত? কই কখনো সিঁথিতে সিঁদুর তো দেখিনি। আজও নেই। তাহলে? তুমি কি বালবিধবা?'

'না।'

'তাহলে?'

'সে একটা কাহিনি। তার সঙ্গে আমাদের ঘরের কথা জড়িত, বাইরে বলা যায় না।'

'না, বলতেই হবে। তোমাদের ঘরের কথার সঙ্গে আমার জীবন আজ জড়িয়ে গেছে। বল, বল।'

কোনো উত্তর নেই।

'দেখ, সব কথা না বলে তুমি আজ এখান থেকে যেতে পারবে না।'

'জবরদস্তি?' তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা।

'অনুরোধ কাকুতি মিনতি জোরজবরদস্তি, যা ইচ্ছে বলতে পার। কিন্তু সব খোলসা করতেই হবে।'

সেই জনমোহিনী মধুর কণ্ঠে শেফালি শুরু করে তার বৃত্তান্ত। নতুন কিছুই নয়। সেই জমিদার পূর্বপুরুষদের উন্মার্গগামী আচার আচরণ, লালসা নৃশংসতা, স্ত্রীকে অসম্মান অবহেলার অতি পরিচিত কাহিনি। অতি পরিচিত সেই আগ্রাসী পুরুষের একই সঙ্গে কন্যার প্রতি অনাবিল স্নেহ ও প্রশ্রয়, বিলিতি ডলপুতুল থেকে দিশি পায়ের নূপুর বা গলার হার এনে তার মন জয়, মুখে বুলি ফুটতে না ফুটতে গৃহের বাইরের মহলের বাসিন্দা উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওস্তাদ কিষাণ মহারাজের কাছে গান শিখতে বসিয়ে দেওয়া। ওদিকে অন্দর মহলে চিরাচরিত ভয়াল নৈশ নাটক অনুষ্ঠিত। তার মায়ের প্রতিক্রিয়া—একটানা চিৎকার চেঁচামেচি ও ঘন ঘন ফিটের রোগ, পিতার আরও আক্রোশ, পিতামহীকে দোষারোপ, 'একটা হিস্ট্রিরিয়াগ্রস্ত রুগ্ন স্ত্রীলোক আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছ।' তার বাইরের টান চতুর্গুণ হয়ে যায়। নিজের অনুরূপ অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত দিয়ে পিতামহীর পুত্রবধূকে সান্ত্বনা ও সহ্যের উপদেশ। মাতৃদেবীর ঠাকুর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ এবং স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে ক্রমে ধৈর্য লাভ, রোগেরও উপশম। শুধু নিজের ঠাকুরঘরে আশ্রয় নিলেন না, একমাত্র কন্যাকে সমর্পণ করলেন নারায়ণের পায়ে। সমানে তার কানে মন্ত্রের মতো আউড়ে গেলেন, 'শ্রীকৃষ্ণই বিশ্বে একমাত্র ভালোবাসার মতো পুরুষ, বাকি সবাই তোর বাবার মতো অসুর, দৈত্য।'

'কিন্তু মা, বাবা কেন অসুর হবে, আমাকে তো বাবা কত ভালোবাসে, কত খেলনা কত জিনিস এনে দেয়, বাবাই তো মহারাজের কাছে গান শিখতে বলে, আমার খুব ভালো লাগে গান করতে।'

মা মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বলে এলেন, শেফালিকে যেন মীরার ভজন ছাড়া আর কিছু না শেখান।

'কিন্তু ওর এত মধুর কণ্ঠ, এত চড়ায় ও এখনই গাইতে পারে, ঠুংরি ওর—

'না, শুধু মীরার ভজন, নয় গান শেখা বন্ধ।'

মা তাকে ঠাকুর ঘরে এনে সামনে বলতেন, 'এই যে দেখছিস শ্রীকৃষ্ণ, এতটুকু পাথরের মূর্তি হলেও এঁর প্রাণ আছে, ইনিই শুধু তোর ভালোবাসার মানুষ, মনে রাখিস।'

ফুল-বেলপাতা বা ভোগ নিবেদনের মতো মায়ের এ সব কথা প্রাত্যাহিক পুজো আর্চার অঙ্গ মনে করত শেফালি।

আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বিয়ের নিমন্ত্রণে গেলে কেউ যদি তার মেয়ের ভবিষ্যতের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলত, মা থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলতেন, 'সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে।' ওর যখন ন' বছর বয়স, মা এক দিন পাঁজি দেখে সকালে বললেন, 'আজ শুভ দিন। তুই উপোস করে থাক।' সন্ধ্যাবেলা ওর এতটুকু শরীরের নিজের বিয়ের সাচ্চা জরির কাজকরা ভারী লাল বেনারসিটা জড়িয়ে, নিজের ভারী ভারী গয়না পরিয়ে ঠাকুর ঘরে নিয়ে বললেন, 'প্রণাম কর। গা তো সেই ভজনটা, 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোই।' গান শেষ করলে তার হাতখানা বিগ্রহের হাতে দিয়ে বললেন, 'ঠাকুর, তোমাকে আমি আমার কন্যা শেফালিকে সম্প্রদান করলাম। আজ থেকে তুমি ওর স্বামী।'

অমল থাকতে না পেরে বলে ওঠে, 'এই তোমার বিয়ে! এতো স্রেফ মীরা বাইয়ের গাঁইয়ামার্ক যাত্রাপালা, ফিল্মি গপ্পো পর্যন্ত নয়। শেফালি, এটা কোন সাল খেয়াল আছে? ভারত স্বাধীন, মেয়েরা এখন বাইরের জগতে বেরোচ্ছে, লেখাপড়া শিখছে, স্বাধীনতার জন্য পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে না পেরে তোমার মা মধ্যযুগে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মাথা খারাপ হয়েছিল। তাই বলে তুমি তাঁর কথা বেদবাক্যের মতো মেনে নেবে? নিজের বুদ্ধিবিবেচনা কিছুই কি তোমার নেই? নিজের জীবনটা নষ্ট করবে? সঙ্গে সঙ্গে আমারও? চোখ খোল, বাস্তবকে দেখ।'

শেফালি নতমুখ, নিরুত্তর। 'আচ্ছা, যুক্তি দিয়ে নিজের আচার আচরণ বিচার করেছ কখনো? তুমি যদি নিজেকে বিবাহিত মনে কর তাহলে তোমার বরাবর এমন বিধবার মতো পোশাক কেন?'

'পাথরের দেবতা যার স্বামী তার তো এ জগতে সংসার হতে পারে না, ব্রহ্মচর্যই তার পালনীয়।

না, হাসির কথা নয়। খ্রিস্টান মেয়েরা যারা সন্ন্যাসিনী হয়, তারা সকলে প্রভু যিশুর কনে—ব্রাইড অফ খ্রাইস্ট।'

'তুমি তো খ্রিস্টান নও, তুমি হিন্দু। আমাদের সন্ন্যাস মানে সংসার ত্যাগ, তখন আর কেউ কারও স্বামী বা স্ত্রী হতে পারেন না। হিন্দু কেন, বৌদ্ধ জৈন কোনো ভারতীয় ধর্মেই সন্ন্যাসিনীরা কারও স্ত্রী হতে পারে না। তারাও সর্বস্বত্যাগী। তুমি তো গান গেয়ে টাকা রোজগার কর, সংসার চালাও। তুমি কীসের সন্ন্যাসিনী? বাস্তব হলো, তোমার মা তোমার উপার্জনটা হাতছাড়া করতে রাজি নন। তাঁর সেই অত্যাচারিতা দুঃখের দিন বহুকাল গত। যখন থেকে আমি তাঁকে দেখছি, দিব্যি জবরদস্ত মহিলা, বৈষয়িক জ্ঞান টনটনে। তোমার কোন রেকর্ড কত বিক্রি হলো, কত রয়ালটি প্রাপ্য, দিব্যি খোঁজখবর রাখেন। জমিদারি স্টাইলে দুঃস্থ আত্মীয় বাড়িতে পোষেন, বিনে মাইনেতে সংসারের কাজকর্ম করিয়ে নেন। কী, আমি ঠিক বলছি কি না?'

শেফালি নীরব, আঁচলের খুঁট হাতে পাকাচ্ছে।

'সব জিনিসে হিন্দুদের ধর্ম টেনে এনে ভণ্ডামি! এই জন্যই আমরা হাজার বছর ধরে পরাধীন। কোনো মুসলমান পরিবারে এরকম হতে পারে? হ্যাঁ, মেয়ের বিয়ে না দিতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম টেনে এনে ভণ্ডামি করে কি?'

শেফালি চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'আমার পক্ষে অন্য কোনো জীবন সম্ভবপর নয়।'

কেমন অসহায় বোধ করে অমল, একটা ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্তি যেন তার সামনে একটা বিশাল নিরেট পাথরের দেওয়াল। খানিক বাদে প্রশ্ন করে, 'আমি, আমি তাহলে তোমার কে? আমার স্থান কোথায়?'

ধবধবে সাদা গলাবন্ধ ব্লাউজ আর সরু পাড় ধবধবে শাড়ির মধ্যে বুকে হাত রাখে শেফালি। ধীরে ধীরে বলে, 'এখানে। চিরকাল।'

'আর আমাদের জীবন কীভাবে কাটবে?'

'গানই আমাদের জীবন।'

দুজনে কতক্ষণ নীরব। কখন বেলা পড়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। হরি ঘরে ঢুকে খট করে আলোর সুইচটা টেপে।

'আঁধারে ভূতের মতো বসে আছ কেন। চা করব আর একটু?'

'শেফালি, আর এক কাপ—

'না না, আর দরকার নেই।'

হরি ট্রেতে খালি কাপপ্লেট তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অতঃপর অমলই বলে, 'চল, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।' পথে দুজনের আর কোনো কথা হয় না।

ফিরে এসে অমল চুপচাপ বসে থাকে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, কোনো কিছুই যেন নেই।

'দাদাবাবু, খেতে দিই, রাত অনেক হলো, আবার ভোর থেকেই তো তোমার সারেগামা।' হরির ভাষায় সংগীতচর্চা।

'তুই খেয়ে নে। আমার খিদে নেই।'

'কী কথা। সেই কোন সকালে দুটি মুখে দিয়ে স্টুডিয়োতে গেছ, টিফিনও কিছু নিলে না। বিকেলে ওই এক খানা চপ। ওতেই খিদে চলে গেল। চল, দুটি যা হোক মুখে দেবে। কথায় বলে, রাত উপোসি হাতি কাবু। চল, চল।'

হরির জবরদস্তিতে অমল খেতে বসতে বাধ্য হয়। পরিবেশন করতে করতে হরি গজগজ করে, 'দিনে তো ঠিক মতো খাওয়া হয় না, রাতেও না খেলে চলবে—।

বিছানায় শুয়ে কতক্ষণ জেগে। ঘুম আসে না। শেষ রাতে চোখ লেগেছে কী লাগেনি, একটা মস্ত পাথর দুহাতে প্রাণপণে ঠেলে ঠেলে পাহাড়ে তুলছে, প্রাণপণে, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ, কোনোক্রমে একেবারে চূড়ায় নিয়ে যেতে পেরেছ। স্বস্তির

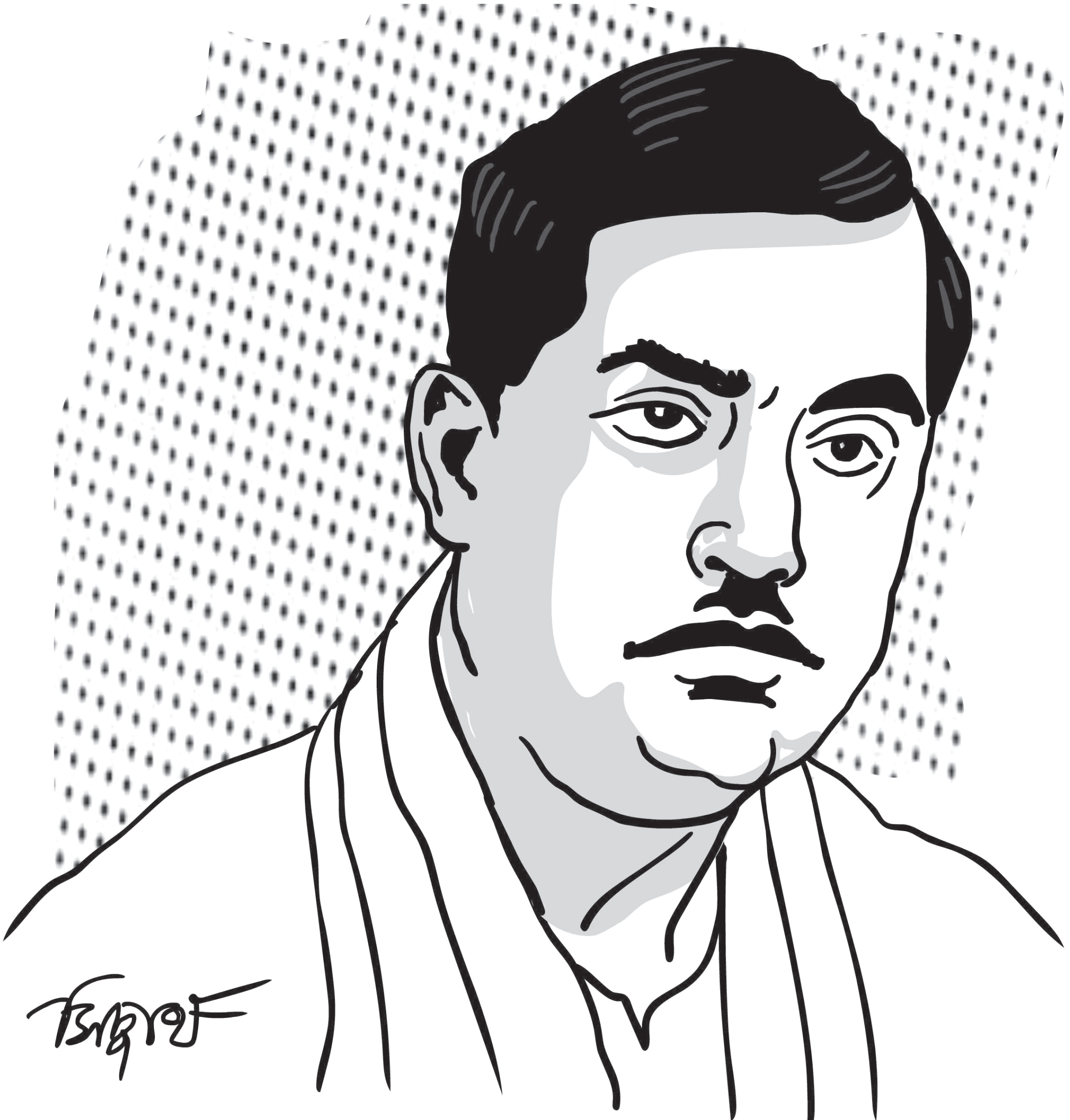


নিঃশ্বাস ফেলে, সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অমনি পাথরটা গড়িয়ে একেবারে তলায় পড়ে যায়। যেখান থেকে সে আবার ওটাকে প্রাণপণে ওপরে তুলেছিল। আবার চেষ্টা করে। আবার পড়ে যায়। আবার আবার আবার। 'না না আমি পারছি না।' ঘুম ভেঙে যায়। ঘেমে নেয়ে গেছে। হরি দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, 'দাদাবাবু, কী হলো চেল্লাচ্ছ কেন?'

গলাটা শুকিয়ে কাঠ। কোনোক্রমে বলে, 'কিছু না, চা-টা কর, আমি আসছি।'

স্টুডিয়োতে পৌঁছয় সারা দেহেমনে একরাশ ক্লান্তি নিয়ে। নতুন একটা ফিল্মের গান রেকডিং আছে। হিন্দি সিনেমায় সবচেয়ে আগে গানের রেকডিং হয়, তারপর ফিল্মের বাকি আর সব কিছু। এখানে ডিসিপ্লিন কড়া, ঠিক সময়ে গাইয়ে, বাজিয়ে, টেকনিশিয়ান সব হাজির। কাজ শুরু হয়। পেশাদার গায়িকা একবার রিহার্সাল দিয়েই বলেন, 'অমলবাবু, আজ আপকা তবিয়ত শায়দ ঠিক নেহি, মুড ভি নেহি মালুম হোতা।'

অমল বলে ওঠে, 'একদম ঠিক হুঁ, আপ খুশিসে গাইয়ে।' কোনো ক্রমে কাজটা তোলে।

কীভাবে যে দিনটা কাটল। বাড়ি ফিরে এসে বাইরের ঘরে ধপাস করে সোফায় গা এলিয়ে দেয়। হরি চা জলখাবার নিয়ে হাজির, 'আজ নিমকি করেছি, দেখতো কেমন হয়েছে', সঙ্গে আজকের ডাক।

প্রথমেই চোখে পড়ে পরিচিত হাতের লেখা, মালিকার চিঠি। খাম খুলে বাঁ হাতে চিঠিটা ধরে ডান হাতে নিমকিতে কামড় দেয়,'অমল বাবু, আমি এখন কলকাতাতেই থাকি। এখানে কাজীসাহেবের সব গানের—মানে যেগুলো রেকর্ড হয়েছে— জোগাড় করছি। প্রত্যেকটা আমি গলায় তুলছি। আপনি কবে আসবেন? আপনাকে ছাড়া আমি তো কী করছি ভালো না মন্দ কিছুই বুঝতে পারি না। (আম্মু লিখে কেটে দিয়ে লিখছে), মা এবার আসতে পারেননি, আমি আপা মানে দিদির সঙ্গে এসেছি। আজকাল আমি রসুই শিখে গিয়েছি। আপনাকে নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াতে চাই। কবে আসছেন?'

আর একটা চিঠি এক ফিল্ম ডিরেক্টরের কাছ থেকে, নতুন ফিল্ম করছে, অমলবাবু কি সুর দিতে আসতে পারবেন? এমন চিঠি আগেও তো পেয়েছে। দু'চারটে কাজ করেওছে

কলকাতায়। কিন্তু আজ কেমন অন্যরকম লাগল। হরি চা নিয়ে ঘরে এলে অমল বলে, 'আচ্ছা হরি, কলকাতা ফিরে গেলে কেমন হয় রে?'

'খুব ভালো হয় দাদাবাবু, চল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। তারপর বিয়ে থা করে—'

'চুপ। ফের সেই ভাঙা রেকর্ড।'

'আচ্ছা বাবা, সংসারের কথা তুলব না, কান মুলছি। কবে যাবে?'

'দাঁড়া, ওরকম যাব বললেই তো সংসার তুলে দিয়ে যাওয়া যায় না। এখানকার কাজ সব শেষ করে তবে।'

হরি এবার একটু চিন্তিত, 'একেবারে পাট তুলে দেবে? এত টাকা সেলামি দিয়ে বাড়ি নিলে সেটা কী হবে? এত আসবাব পত্তর দিয়ে সাজালে, সব ফেলে দেবে? তোমাকে তো বম্বে আসতে হবে গানের, ফিলিমের কাজে, কোথায় উঠবে?'

'দেখি।'

।। ছয়।।

অতঃপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। হ্যাঁ, বেশ ক'মাস সময় লাগল। ইন্ডাস্ট্রির লোকজনের বিস্ময়, কলকাত্তা ওয়াপিস যা রহে হ্যাঁয়! লেকিন কিঁউ? কামধাম কুছ কম হ্যাঁয় কেয়া? আরে আ যায়েগা, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সরকারি নোকরি তো নেহি। কাম আতা যাতা। আপকা রেপুটেশান তো বহোত আচ্ছা হ্যাঁয়।'

অমল বলতে বাধ্য হয়, 'নেহি উও সব বাত নেহি। থোড়া বহুত ফ্যামিলি প্রবলেম হ্যায়।'

ভারতীয় সমাজে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পরিবারের দাবি সর্বাগ্রে, সবাই মানে। 'আফশোস কী বাত।' ব্যাস সেখানেই খেদ প্রকাশ শেষ। বম্বে ফিল্ম দুনিয়ায় সর্বদা প্রতিভার আমদানি চলেছে, কেউ অপরিহার্য নয়। অতঃপর বিদায় আরব সাগর।

লটবহর নিয়ে বিষণ্ণ মনে শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে কলকাতায় বাড়ি পৌঁছে প্রথমে সানন্দ বিস্ময়, মালিকা অপেক্ষা করছে। প্রথম সাক্ষাতেই মনে হয় আরে কী সুন্দর একটি তরুণী, তন্বী গৌরাঙ্গী, ডিম্বাকৃতি মুখের ঢৌলটি কী কমনীয়। একটু চওড়া কপাল, একটু বেশি লম্বা নাক, পাতলা ওষ্ঠাধর সব মিলিয়ে যেন মধ্যপ্রাচ্যের ছোঁয়া। আর সেই সরু সরু টানা টানা চোখদুটি, আগের মতোই তলার দিকে সরলরেখা আর ওপরে বাঁকা তলোয়ার, কিন্তু সেই কালোসবুজ ছাই মেশানো রঙের চোখের মণি এখন গাঢ় সুর্মার প্রসাধনে যেন শান্ত, প্রায় স্বাভাবিক। অমল তার দিকে তাকিয়েই থাকে।

'কী হলো, চিনতে পারছেন না নাকি?' স্মিত মুখে বলে মালিকা।

'তুমি এখানে?'

'আরে মশাই আমি তো সমানে চিঠি লিখে লিখে শেষে এক লাইনের উত্তর পেয়েছিলাম, অমুক দিন অমুক সময়ে অমলবাবুর প্রত্যাগমন হইবে।'

অতঃপর বাড়িতে এসে বিহারি দারোয়ানকে তার বাংলায় লেখা চিঠি দেখিয়ে গলা চড়িয়ে কর্ত্রীর মতো সাফাই গোছগাছ ইত্যাদি করেছে। তার সঙ্গে এক শক্তপোক্ত বিশালকায় হামিদা বানু টাইপের নোকরানি নাকি বডিগার্ড, একেবারে ঢাকার বাড়ি থেকে আমদানি। এখন পার্ক সার্কাসের বাসা থেকে টিফিন ক্যারিয়ার বোঝাই করে দুজনে ভাত, ডাল, সালন আর চিতল গাদার মুইঠ্যা নিয়ে এসেছে।

বিস্মিত অপ্রস্তুত অমল সমানে বলতে থাকে, 'তুমি কেন এত ঝামেলা করতে গেলে। আমি আর হরি হোটেলে খেয়ে নিতাম, কোনো অসুবিধা হতো না' ইত্যাদি।

'কী যে বলেন, আমি থাকতে হোটেলের ভাত কেন খাবেন। দেখুন কেমন রেঁধেছি।'

'তোমাদের বাড়িতে আমাকে একলা বসিয়ে খাইয়েছিলে। তেমনটি আজ চলবে না। এটা আমার বাড়ি। তুমি আমার সঙ্গে বসে খাবে।'

খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে মালিকা। কী ঝকঝকে হাসি। এই প্রথম অমল মালিকার এমন প্রাণখোলা হাসি দেখল। এতদিন তো মুচকি হাসি দেখত আর অস্বস্তি বোধ করত যেন কোথায় একটা সূক্ষ্ম পিন ফোটানোর ব্যাপার থাকত। আজ একেবারে অনাবিল মোলায়েম হাসি। স্নান করে এলে মালিকা পাকা গিন্নির মতো গুছিয়ে পরিবেশন করে। 'আরে, শুধু আমার কেন, বলেছিলে না তুমিও সঙ্গে বসবে।'

'একটু দিয়ে নিই, তারপর বসে পড়ব।' হ্যাঁ, বসে পড়ে। দুজনের হালকা কথাবার্তা। অমল খুব তৃপ্তি করে খায়। কত দিন পর যেন পরিবারের ছোঁয়া। কোনো নারী যত্ন করে তাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াচ্ছে। গোটা ব্যাপারটা এক জনের আদৌ পছন্দ হয়নি। হরি, তার মুখে ঘন মেঘ। তাদের খাওয়া হয়ে গেলে সে শব্দ করে, যেন অনিচ্ছায়, এঁঠো বাসন তুলতে তুলতে বলে, 'আমি বাইরে থেকে খেয়ে আসছি।'

'কেন, অনেক খাবার এনেছি। তুমি এখানেই খেতে পার।'

'মালিকার কথার উত্তরে জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'এ সব আমার চলবে না। আমি দ্বারিক ঘোষ থেকে পুরি ছোলার ডাল খেয়ে নেব।'

অমল একটু অপ্রস্তুত। বোঝে কেন হরি মালিকার হাতে রান্না খাবে না। 'ও ওরকমই। কথায় বলে না, কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না। ওর কথা ভেবো না।'

মালিকা চুপ। একটু বাদে বলে, 'আমি এখন আসি। আপনি

ক্লান্ত, বিশ্রাম করুন।’

‘বেশ। আমাকে দুটো দিন সময় দাও, গুছিয়ে বসতে। পরশুর পরের দিন সকাল দশটায় এসো, তোমার নতুন গান নিয়ে বসব। এত কষ্ট করে আমার জন্য রান্নাবান্না করলে, বাড়িঘর পরিষ্কার গোছগাছ সব দেখাশুনা করলে। অনেক ধন্যবাদ।’

‘এরকম ভদ্রতা আদবকায়দা দেখালে খুব খারাপ লাগে। পর পর মনে হয়। আমি তো আপনাকে আপন ভেবে নিজের খুশিতে সব করি। ধন্যাবাদটাদ দেবেন না।’

‘ভুল হয়ে গেছে, আর দেব না। তবে তুমি এখনই পাকা গিন্নি হয়ে গেছ। কত বয়স হলো তোমার?’

‘একেবারে বুড়ি।’

‘বুড়ি!’

‘বাঙ্গালির মেয়ে কুড়িতে বুড়ি জানেন না?’ হা হা হা। হিহিহি।

‘তুমি ফিরবে কীসে?’

‘যাতে এসেছি। একটা ঘোড়ার গাড়ি কয়েক ঘণ্টার জন্য নিয়েছি। হ্যাঁ, কোনো কোনো পাড়ায় ঘোড়ার গাড়ি এখনো পাওয়া যায়। এ কোচোয়ানটা আমাদের চেনা, ঢাকা থেকে আমাদের কেউ এলেই এসে যায়। কোনো ঝামেলা নেই।’

ভাগ্যে কলকাতায় ফেরার প্রথম অভিজ্ঞতা অন্তত মধুর। পরদিন থেকেই শুরু হলো সমস্যা। প্রথম চোট বাড়িওয়ালার বাড়ি ছাড়ার অনুরোধ। না, বছর দুয়েক ধরেই সে কলকাতায় এলে তাড়া দিচ্ছিলেন, ‘আপনি তো থাকেনই না, বাড়িটা পড়ে আছে, দেখাশুনা নেই। এখন সে ফিরে আসা মাত্র একেবারে হামলে পড়ে, কত লোক এখন ভাড়া চায়, পার্টিশানের পর কলকাতায় হুহু করে লোক বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড চাপ, আর আপনি একলা মানুষ, এই ভাড়ায় একটা আস্ত দোতলা বাড়ি দখল করে আছেন।’ বা, ‘এ বাড়িতে অন্তত তিনটে রিফিউজি ফ্যামিলি থাকতে পারে। আর আপনি একা, তাও সর্বদা থাকেন না। কী রকম লাগে বলুন তো? আমার লোকসানের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম।’ শেষে, ‘আপনি মান্য গণ্য মানুষ, আমি আপনাকে অসম্মান করতে চাই না। হাত জোড় করছি, দয়া করে অন্যত্র উঠে যান।’

যত চাহিদা সেই অনুপাতে নতুন বাড়ি হচ্ছে কই। কলকাতায় এখন ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই। এদিকে জনারণ্য, কিন্তু মজা হলো কাজের লোক নেই। অমলের পুরনো ঠাকুর যে বম্বে যাবে না বলে বালেশ্বরে তার গ্রামে চলে গিয়েছিল, তার ছেলেরা এখন দাঁড়িয়ে গেছে। সাহেবরা চলে যাবার পর কলকাতায় সমানে যে ডামাডোল চলছে, তার মধ্যে বাবাকে ফেরত পাঠাতে ছেলেরা ইচ্ছুক নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হলো রিফিউজিদের মধ্যে অভাব অনটনের কাঁদুনি অবিরাম, কিন্তু কলকারখানা, আপিস কাছারি, ঘর গেরস্থালির যে সব কাজ এই মহানগরীতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে সেসব কর্ম করার লোক বিশেষ নেই। এক জবাব, ‘আমাগো হেই সব কাম করনের অভ্যাস নাই।’ ভাগ্যিস বিহারের দারোয়ান ভজন আছে, আর পশ্চিমবঙ্গের হরি বম্বেতে দিব্যি চাকর থেকে কম্বাইন্ড হ্যান্ডে প্রোমটেড হয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসেই বলতে শুরু করেছে, ঠাকুর একটা লাগবে, এখানে আমার অনেক কাজ, বড়ো বাড়ি জিনিসপত্র ঝাড়াঝুড়ি।’ শেষে অগতির গতি পুরনো ঠাকুরের গাঁয়ের থেকে রাঁধুনি আমদানি। কাছের বস্তি থেকে একটি স্থানীয় ঠিকেঝি ঘরদুয়ার ঝাড়ামোছার জন্য পাওয়া গেল। তার শখের বুইক গাড়ির ড্রাইভার হলো ইউপি’র শর্মা। অমল সেনগুপ্ত স্টাইলে থাকতে অভ্যস্ত।

মালিকা যথারীতি দুদিন পরে হাজির, সঙ্গে সেই হামিদা বানু নোকরানি কাম বডিগার্ড। ‘ও যদি একটু বাইরে বেঞ্চিতে বসে অসুবিধা আছে?’

মালিকা মাথা নেড়ে তাকে ঘরের বাইরে বসিয়ে আসে। এ দু দিন পাঁচটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অমলের সমানেই মনে হয়েছে এতদিন সে মালিকার প্রতি অবিচার করেছে। সে তো প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই অন্তরঙ্গতার জন্য উন্মুখ, কোনোদিন বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। অথচ অমল তাকে না দিয়েছে সময়, না করেছে তার সঙ্গে সম্পর্কের লালন পালন। এত বছরে মোটে ক’টাই-বা তার রেকর্ড হয়েছে। সে তুলনায় শেফালি ছিল তার ধ্যান জ্ঞান পরিশ্রম....না, তার কথা আর মনে করবে না। সে অধ্যায় সমাপ্ত। সত্যি কি সমাপ্ত? এখনও তো তার গানে সুর বসিয়ে চলেছে। ওটা অভ্যাসবশত। কত গাইয়ের গানে তো অমল সেনগুপ্ত সুর দেয়। সেও তাদের এক জন, ব্যস।

দুদিন বাদে আবার মালিকা হাজির। অমল খেয়াল করে তার পরনে সরু পাড় সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। অল্পবয়সি মেয়েদের তো মায়েরা কত রংবেরঙের শাড়ি পরায়। এখনো কি শেফালির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলেছে। না, পোশাক আশাক সাজসজ্জা নিয়ে কিছু মন্তব্য তার করা অনুচিত। গুরুত্ব দেবে না। সোজা কাজ নিয়ে বসে। আজ যেন উপলব্ধি করে মালিকার কণ্ঠস্বর একেবারে অন্য ধরনের, ভরাট, সবল, সিনেমার নায়িকা মার্কা সরু কিটকিটে মিষ্টি নয়। কাজীদার গানের রত্নভাণ্ডারের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারবে। অমল মনপ্রাণ দিয়ে লেগে যায়। তাকে গড়ে পিটে অতুলনীয় করে তুলবে। প্রতিদিন কঠোর নিয়মে রেওয়াজ, এতটুকু নড়চড় নেই। সমানে মন্ত্রজপের মতো শেখা, ‘সংগীত শখ নয়, সাধনা।’ এবং ‘গান গাইবে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে, পৃথিবীকে ভুলে যাবে।’ বা ‘এমন ফিট গলা হবে যে দরকার হলে দিনে এক সিটিঙে তুমি দশটা গান যেন রেকর্ড করতে পার।’

মালিকা আস্তে করে বলে, ‘আপনি যেমন এক দিনে

তিরিশটা গানে সুর দেন।'

হেসে ফেলে অমল, 'হ্যাঁ। তুমি আমার শিষ্যা, গুরুর মান রেখো। তবে রেকর্ড পরে, আগে কাজীদার গানগুলো ঠিকঠাক গলায় তোল।'

তালিমের প্রত্যেক দিন মালিকা কিছু না কিছু রেঁধে নিয়ে আসে, অমলের আপত্তি কানে তোলে না। 'এই কাবাবটা রাঁধার জন্য আমি সেই ভোরবেলা উঠেছি, খাবেন না মানে। আবার পরোটা কেন জিজ্ঞাসা করছেন। বারে, কাবাব খাবেন কী দিয়ে।'

মুখে আপত্তি করলেও মোগলাস ঢঙে পেটপুজোটা অমলের মন্দ লাগছে না। হরির বাঁধাধরা বাঙ্গালি মেনু থেকে মুখ বদলানোর চেয়েও বড়ো কথা একটি নারীর সযত্ন হাতের ছোঁয়া।

মাস ছয়েক বোধহয় হয়েছে, একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ ক্রিং ক্রিং। হরি ধরেই জোর গলায়, 'দাদাবাবু বড়দার ট্রাংকল।'

দাদা ফোন সর্বদা রাতে করে। আজ এই অসময়ে! অমল গিয়ে ধরতে না ধরতে বড়দার কান্নাভরা গলা, 'অমু, মা আর নেই।'

বড়ো বউদি রিসিভারটা নিয়ে বলে চলেন, 'এক্ষুনি মেজকাকার টেলিগ্রাম হলো। মা গতকাল ভোরে চলে গেলেন। ওখানে প্রচণ্ড গরম পড়েছে, রাখা গেল না, শেষ কাজ করে ফেলতে হলো। কাছে শুধু ওঁরাই ছিলেন, ছোটো কাকারা তো ওখানকার পাট চুকিয়ে দিল্লিতে বড়ো ছেলের কাছে। এদিকে মা কিছুতেই খুলনার বাড়ি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। তাই মেজকাকা মাকে একলা ফেলে ডিব্রুগড়ে ছেলের কাছে যেতে পারছিলেন না। আমরা কতবার মাকে নিয়ে আসতে চেয়েছি, মেজঠাকুরপো তো মায়ের ওখানে থাকা নিয়ে প্রায়ই রাগারাগি করতেন। ওঁর সেই এক কথা 'স্বামীর ভিটেয় মরব।' তাই হলো। ঘুমের মধ্যে গেছেন, পুণ্যাত্মার মরণ।'

দাদা আবার কান্নাভরা গলায় ফোন ধরে, 'আমরা তিন ছেলেই যোগ্য, প্রতিষ্ঠিত, তবু শেষ সময়ে আমরা কেউ মুখে জলটুকু দিলাম না, তিনি কোনো ছেলের হাতে মা আগুন পেলেন না, অমু রে....'

অমল কোনও কথাই বলতে পারে না। কখন দাদা-বউদি ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। কবে শেষবার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? পার্টিশানের পরে দেশে যেতে পেরেছে কি? কবে শেষ চিঠি লিখেছে? মনে করতে পারে না। একমাত্র মা-ই ছিলেন তার কাছের মানুষ। আর তাঁকেই কীভাবে সে দিনের পর দিন অবহেলা করল। কেন কীসের জন্য। সমানে আরও গান আরও ফিল্ম। আরও আরও খ্যাতির পিছনে দৌড়িয়েছে, শেফালির আরও গানে সুর দিয়ে তার সাফল্য তার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে গেছে। আলেয়ার পিছন পিছন ছুটে চলেছে। ফোনের পাশে চেয়ারটায় বসে পড়ে, দুহাতে মুখ ঢাকে। বুক ভেঙে কান্না আসে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মালিকা। 'মা-ই নেই। আমার আর কেউ রইল না।'

চোখ ছাপিয়ে জল নেমে আসে, অমল আর থাকতে পারে না, সে যে পুরুষ মানুষ, প্রায় মধ্যবয়সি, প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতিমান, সব ভুলে যায়। শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়ে।

'আমি তো আছি।'

দুহাতে তার মাথাটা জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে চেপে ধরে মালিকা। 'আমি সর্বদা আপনার কাছে থাকব, কখনো কোনোদিন ছেড়ে যাবো না।'

মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে থাকে। ছোটোবেলায় মা যেমন খাটে বসে তার শোয়ার সময় মাথায় হাত বুলোতেন, চুলে বিলি কেটে দিতেন। আর অমলের ঘুম এসে যেত। কী শান্তি।

।। সাত।।

বাবার মতো ঘটা করে শ্রাদ্ধশান্তি করা আর মায়ের বেলা সম্ভব হলো না। পার্টিশানের ফলে পরিস্থিতি শুধু নয়, মানসিকতাও বদলে গেছে। অশৌচপালন থেকে শ্রাদ্ধ যে যার মতো নিজের বাড়িতে সম্পন্ন করে। বড়দা ও দিদি জামশেদপুরে, মেজদা বীরভূমে, যেখানে সে এসডিও এবং অমল কলকাতায়। সমানে হরির খবরদারি এবং তার মধ্যে মনোজের আবির্ভাব, যদিও এখন সে পুরোদস্তুর সংসারী আর অমল সেনগুপ্তের চেলাগিরি পোষায় না, তবু বন্ধু হিসেবে দুর্দিনে পাশে থাকল। সব মিটলে, তার আপাত নিরীহ প্রশ্ন, 'মালিকার ফ্যামিলি থেকে ওর বিয়ে শাদি দিচ্ছে না কেন?'

'কে জানে। আমি তো আর ফ্যামিলির ভিতরের খবর রাখি না। তবে মেয়েটির গলা দারুণ।'

'শুধু গলা? চেহারা, হাবভাব, রান্নার হাত সবই দেখছি দারুণ। পুরুষের হৃদয়ের রাস্তা নাকি রসনার মারফত। একেবারে অপ্রতিরোধ্য যবনীসুন্দরী। আচ্ছা, একটা কথা বল, পাকিস্তান হওয়ার পর তো যাতায়াতে খুব কড়াকড়ি। খুলনায় তোর পিতৃপুরুষের ভিটেয় মা মারা গেলেন, তোরা কেউ দেশে যেতে পর্যন্ত পারলি না। আর মালিকা খাতুন এরকম দিনের পর দিন হিন্দুস্থানে দিব্যি রয়ে যাচ্ছে কী করে?

অমল জানে না, জানার চেষ্টাও করেনি। মনোজের খোঁচা খেয়ে এক দিন জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মালিকা, তুমি তো আগে মায়ের সঙ্গে অল্প দিনের জন্য কলকাতায় আসতে। এখন একলা পার্ক সার্কাসের বাড়িতে মাসের পর মাস আছ কী করে?'

'ওমা, একলা থাকব কেন। আমার আপা মানে দিদি, তার

তিন ছেলে, সবাই আছে। আমার থেকে বড়ো? তা ১৭/১৮ বছরের বড়ো হবে। আমাদের দুজনের মধ্যে তিনজন ভাই আছে। হ্যাঁ, আমরা পাঁচ ভাই-বোন। আমি সবচেয়ে ছোট, তাই মা আমাকে নিয়ে পড়ে থাকেন।

ভাইজানেরা সব পাকিস্তানে। কে কী করে? বড়োজন আব্বুর মতো ঢাকায় উকিল, মেজ সরকারি চাকরিতে, রাজশাহীতে পোস্টেড, ছোটো বিজনেস করে, হ্যাঁ, ঢাকাতেই। আমার আপার কলকাতায় শাদি হয়েছে, দুলাভাই বিএ পাশ কিন্তু চাকরিবাকরি না করে ঠিকাদারি করে।

অমল এত বছরে মালিকার পরিবার সম্বন্ধে কিছুই জানত না। তার আবছা একটা ধারণা, মালিকার পরিবার মানে মা আর মেয়ে। অবাস্তব ধারণা, কিন্তু সেটাই আঁকড়ে ছিল বরাবর। 'তা তোমার আপা পার্ক সার্কাসের বাপের বাড়িতে বরাবর থাকেন নাকি শ্বশুর বাড়িতে থাকেন?'

আরে সেখানেই তো বিশ বছর ধরে থেকেছে। এইতো রিপন স্ট্রিটে। ক'মাস আগে দুলাভাই আপাকে তালাক দিয়েছে, তবে ছেলেদের ঝঞ্ঝাট চায় না, বাড়িতে মা-টা কেউ নেই কিনা তাই আপার কাছেই ওরা থাকে। ওদের জন্য টাকাও দেয়। আপা প্রথমে সবাইকে নিয়ে ঢাকা ফিরে গিয়েছিল, দুলাভাই ওদের পাকিস্তানে রাখতে চায় না, নিজেও পাকিস্তানে যাবে না, উলুবেড়িয়ায় অনেক সম্পত্তি আছে। ছেলেরা পাকিস্তানে পড়াশোনা করলে পরে ইন্ডিয়ায় চাকরি পাবে না, তাছাড়া স্কুল, কলেজ কলকাতায় অনেক ভালো। তাই আপা এখন পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। ছেলেরা কত বড়ো? বড়ো ছেলে ইসলামিয়া কলেজে বিএ পড়ে, ছোটো দুজন আই এ আর ক্লাস টেনে। ওদের জন্যই তো আম্মু মানে মা, আমাকে সঙ্গে পাঠাল, আপা ঘরের কাজে একেবারে চোস্ত, কিন্তু বাদবাকিতে একটু বোকাসোকা, বাইরে বেরোতো টেরোতেই পারে না। ওকে তো আমার মতো লেখাপড়া শেখানো হয়নি। একা থাকতে পারে না।

'তুমি খুব সাহসী, তাই তো?' মালিকা হাসে, ঘাড় হেলায়।

'এত বছর বিয়ের পর তোমার দুলাভাই দিদিকে তালাক দিল কেন?'

মালিকা দু'কাঁধ ঝাঁকায়, 'মরদদের মর্জি। পুরনো বিবি বুড়ি, জোয়ান বিবিটিবি জোটাতে চায় আর কী।'

অমলের একটু অস্বস্তি লাগে। হিন্দুদের বহু বিবাহ রাজরাজড়া আর বাঙ্গালি কুলীন ব্রাহ্মণদের অতীত ইতিহাস মাত্র। ভদ্রশ্রেণীতে সন্তানবতী স্ত্রীর বয়স হয়ে গেলে বয়স্ক স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে এবং প্রথমার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ অকল্পনীয়। মালিকার মুখে ভাবে ভঙ্গিতে তালাকের এত স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা কীভাবে নেবে বুঝে উঠতে পারে না। কেমন অন্য এক অজানা অচেনা জগৎ। তার অস্বস্তি যেন আঁচ করেই ঘোরায় মালিকা, 'তা ছাড়া আম্মু চান আমি আপনার কাছে গান শিখি, রেকর্ড করি, আমার নাম হোক। ঢাকায় থেকে তো সম্ভব নয়।'

অমলের হাতে এখন বিস্তর সময়। সে যখন বম্বে চলে গিয়েছিল, বাংলা গানের জগতে হায় হায় পড়ে গিয়েছিল। যখন ফিরে এল, সবাই হামলে পড়ে স্বাগত জানালো। এক বছরেই অন্য প্রতিভা এসে গেছে। প্রকৃতিতে কোনো স্থান শূন্য থাকে না। এইতো সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'গাঁয়ের বধূ'র অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। বাংলা গান এখন কত দিগন্ত জয় করছে, আর সেই প্রেম ভক্তি স্বদেশীর বাঁধাধরা গতে বন্দি নয়। অমল খুশি আবার কিঞ্চিৎ নার্ভাস। তবে না, পুরনো গীতিকাররা তাকে মোটেই ভোলেনি। গোটা কয়েক গানের প্ল্যান হয়। এবারে যেখানে আসল রোজগার, সেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পুরনো প্রডিউসার ডিরেক্টরদের সঙ্গে সন্তর্পণে যোগাযোগ করে।

'ও, অমলবাবু নাকি, তা ক'দিনের জন্য আসা? পারমানেন্টলি ফিরে এলেন? বেশ বেশ। হ্যাঁ, এখন একটা ফিল্মের কাজ চলছে বটে, তবে তার তো মিউজিক ডিরেক্টর ঠিক হয়ে গেছে, দেখি পরেরটায় আপনার কথা ভাববো।

প্রথম প্রথম অমল অপমানিত বোধ করত। ক্রমে সয়ে গেল। জীবনটা যেন সাপ লুডো খেলা, কখনো মইয়ে চড়ে তুঙ্গে, কখনো সাপের মুখে পড়ে একেবারে ধরাশায়ী।

এত দিন বাদে কম ব্যস্ততা উপভোগই করে। তাছাড়া হাতে সময় আছে, মালিকাকে নিয়ে বসতে পারে। সেও বাধ্য ছাত্রী, একেবারে প্রশ্নহীন আনুগত্য। শেফালির চেয়ে বেশি তো কিছু কম নয়। বরং তার সঙ্গে আদানপ্রদানের অভিজ্ঞতা পঞ্চেন্দ্রিয়ের রূপ রসে ভরা, অনেক তৃপ্তিজনক। এগারো বছরের পরিচয়ে তার সঙ্গে যতটুকু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এগারো মাসে তার এগারো গুণ। একমাত্র কাঁটা হরির গম্ভীর মুখে স্পষ্ট আপত্তির ছায়া, মনোজের তীর্যক ঠাট্টা, যবনী সুন্দরী কতদূর এগোল, প্রগ্রেস রিপোর্ট দাবি।

বম্বের রমরমা না থাকলেও মালিকার সান্নিধ্যে একটা শান্তি ও সন্তোষের আবহ। এমন সময়ে বজ্রাঘাত, অবশ্য বিনা মেঘে নয়, এ ধরনের বিপর্যয় বেশ কয়েকটা সম্প্রতি ঘটেছে, কিন্তু অমল তো বরাবরই বাইরের জগতের প্রতি উদাসীন। কাজেই সাবধান হয়নি। বাঙ্গালি মালিকানার অনেক ব্যাংকের মতো সোনার বাংলা ব্যাংকও ফেল করল। যারা যারা ব্যাংকে টাকা রেখেছিল তাদের সকলের মতো অমল সেনগুপ্তেরও এতদিনের সমস্ত সঞ্চয় নিশ্চিহ্ন। আক্ষরিক অর্থে নিঃসম্বল হলো অমল। এখন আর তার উঠতি বয়স নয়। কর্ম জীবনের অনেকটা পথই পেরিয়ে এসেছে। এ ক্ষতি পূরণ করবে কী করে।

মালিকা আবার পাশে। হাতে হাত রাখে, 'কেন ভেঙে

পড়ছেন। টাকা গেছে, টাকা আবার হবে। আপনার প্রতিভা তো যায়নি। সেটাই তো আপনার সব চেয়ে দামি মূলধন।'

ভাগ্যিস, বম্বের এ ক'বছরের উপার্জন সোনার বাংলার গর্ভে ঢোকায়নি। মালিকা বড়ো আপন হয়ে যায়। তার সঙ্গে হিসেব করতে বসে, কত রইল, কীভাবে চলবে। বুইক গাড়িটা বেচে একটা ছোটো অস্টিন কেনা হোক। বাজেট করে, একেবারে গৃহিণীর মতো। এদিকে বাড়িওয়ালা তাকে বাড়িছাড়া করবেই, জীবন দুর্বিসহ করে ফেলেছে। এখন ছোট ফ্ল্যাটও এই এত বড়ো বাড়ির সমান ভাড়া চায়। তার ওপর বম্বের মতো কলকাতায়ও আজকাল সেলামি চাইছে। মালিকা খবর আনল, পার্ক সার্কাসে কম ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া সম্ভব। জানাশোনার মধ্যে।

'অমলবাবু, একটা কথা বলব, অপরাধ নেবেন নাতো?'

অমল একটু অবাক, 'তোমার কোনো কথায় কবে আমি দোষ ধরেছি?'

মালিকা একটু চুপ করে থাকে, আঁচলটা কাঁধ ঘুরিয়ে সামনে টেনে বুকের ওপর ফেলে। 'বলতে ভয় হয়।'

'ভয় আমাকে?' অমল হেসে ফেলে, 'কেন? কী এমন কথা?'

মুখ নীচু করে মালিকা আস্তে আস্তে বলে, 'বলছিলাম কী, আমাদের আলাপ পরিচয় আজ দশ-বারো বছর হয়ে গেল। পরিবারের বাইরে আপনাকে ছাড়া আর কোনো পুরুষকে আমি জানি না। আপনার কাছে আমি দিনের পর দিন আসি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই, গানের তালিম নিই, আমাদের মুসলমান সমাজ একেই গানবাজনা পছন্দ করে না, তার ওপর আমি একজন অবিবাহিতা মেয়ে। একেবারেই ভালো চোখে দেখে না। বললে কম বলা হয়। দুলাভাই ছেলে-মেয়েদের জন্য টাকা দিতে এসে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে যান, চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গেছে। আপাকে সমানে বলছেন আম্মি আব্বুকে জানানো দরকার।'

'কিন্তু তুমি তো আমার কাছে একলা আস না। আগে তোমার মা নিজে সঙ্গে আসতেন। এখনও সর্বদা তোমার সঙ্গে একেবারে ঢাকা থেকে সঙ্গে আসা জাঁদরেল বডিগার্ড থাকে। ওইতো ঘরের বাইরে টুলে বসে ঢুলছে তোমার বিলকিস ওরফে হামিদা বানু—' অমল ব্যাপারটা হালকা ভাবে নেয়।

'বিলকিস সঙ্গে থাকুক বা না থাকুক, আমাদের দেখাসাক্ষাৎ বা গান, কোনোটাই সমাজ চায় না। কিন্তু আমি গান ছাড়ব না, আপনাকেও ছাড়ব না।'

এবারে অমল হতভম্ব। 'তা আমাকে কী করতে বল? কী চাও তুমি?'

মুখ নীচু করেই মালিকা বলে,' আমি চাই, আপনি বরাবর আমার কাছে থাকুন।

'বরাবর! তা কি হয়? আজ বাদে কাল তোমার বিয়ে শাদি হবে, নিজে সংসার করবে, এইতো দিব্যি রান্নাবান্না ঘরগেরস্থালি শিখে গেছ। চমৎকার সংসার করবে।'

'আমি সব কিছু শুধু আপনার জন্য শিখি। গান থেকে রান্নাবান্না। আমি শুধু আপনারই সংসার করতে চাই।

অমল খানিকক্ষণ হতবাক। 'মানে?'

'আচ্ছা, আপনি কী রকম পুরুষ মানুষ বলুন তো? একটা মেয়ে আর কত বেশরম হবে? আমি চাই আমার আপনার শাদি হোক। হলো? এবার বুঝলেন তো? এখন বলুন কী উত্তর দেবেন।'

কয়েক মুহূর্তে নির্বাক অমল। 'আমি তোমার চেয়ে বয়সে কত বড়ো জানো?'

'পুরুষ মানুষের আবার বয়স কী। আপনাদের হিন্দু সমাজে তো তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকা গঙ্গাযাত্রী ন' বছরের মেয়ে বিয়ে করে।'

'ওসব আগেকার দিনের কুলীন ব্রাহ্মণদের অনাচার। হিন্দু সমাজের ক'শতাংশ তারা? বাজে কথা ছাড়ো। আমরা বয়সেই শুধু বেমানান নই, আমাদের ধর্ম আলাদা। আমার নয় বাবা-মা নেই, দাদা-দিদিরা সব ভিন্ন, দূরে থাকে, আত্মীয় স্বজন কে কোথায় সব ছড়িয়ে গিয়েছে, দেশের সাতপুরুষের ভিটে মাটি শ্মশান। আমি এখন সর্বহারা। তোমার তো সব আছে, রাজধানী ঢাকায় পরিচিত খানদানি মুসলমান পরিবার, বাবা-মা, ভাইয়েরা সব স্থিতু। তাঁরা কি তোমার হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে মেনে নেবেন?'

'তাঁরা মানুন কী না মানুন কিছু যায় আসে না। আমার ইচ্ছে মতোই আমি বিয়েশাদি করব। আর আপনাকেই করব।'

মালিকা পূর্ণ দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চায়। কী দৃপ্ত ভঙ্গি, এত শক্তি এত সাহস এতটুকু মেয়ের এল কোথা থেকে? তার সেই আশ্চর্য সরু সরু টানা টানা চোখ দুটো, তলায় সরলরেখা আর ওপরে খোলা বাঁকা তলোয়ার, সেই কালচে সবুজ ছাই ছাই চোখের মণি যেন সেই গাছের ডালে জড়িয়ে থাকা সাপের চোখ দুটোর মতো জ্বলছে, এইবার খপ করে সামনের পোকাটাকে গিলে ফেলবে। 'আপনি কিন্তু আমার প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না কিছু বলেননি। আমি অপেক্ষা করে আছি।'

এ ধরনের প্রস্তাব, এমন প্রশ্ন অমলের নিজের মুখে একদিন শোনা গিয়েছিল, না, সেই দুঃস্বপ্ন মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয় অমল। না, না, তার পুনরাবৃত্তি কখনো হতে দেবে না। কখনো। ঘাড় হেলিয়ে বলে, ' তোমাকে 'না' বলার ক্ষমতা আমার নেই। মালিকা নাম তোমার সার্থক। সত্যি তুমি রানি। আমি কিন্তু ভিখিরি, খেয়াল আছে তো?'

'সব খেয়াল আছে, মশাই আমি অত কাঁচা মেয়ে নই।'

'না, একেবারে পাকা বুড়ি, নিজে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ। শোন, তোমার বাবা মা সবাইকে না জানিয়ে, তাদের সম্মতি ছাড়া কিন্তু এ বিয়ে হবে না। বিখ্যাত সুরকার গায়ক অমল

সেনগুপ্ত ৪০ বছর বয়সে একটি ২২ বছরের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বিয়ে করতে পারে না।

মালিকা এবারে চুপ। মুখ গম্ভীর। 'কী ভাবছ?' অমল প্রশ্ন করে।

'আমাকে তাহলে ঢাকা ফিরে গিয়ে আম্মি আব্বুকে বলাবলি করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সেতো নিশ্চয়। কথা বলে চিঠি দিও। আমিও তোমার বাবাকে লিখব ভাবছি।'

'না, না। আমাকে আগে বলতে হবে।'

।। আট।।

এত দিনে অমল সেনগুপ্তের স্বপ্ন কি সত্যি হতে চলেছে? নারীর কল্যাণ স্পর্শে গড়ে উঠবে সংসার, জন্ম নেবে তার নাম বহনকারী সন্তান। কোনো খবর আসে না। এক সপ্তাহ যায়, দু' সপ্তাহ। পুরো মাস কাবার। কী করবে অমল? চিঠি তো সে ঢাকায় কোনোদিন লেখেনি। মালিকা কলকাতায় এসেই বরাবর যোগাযোগ করত। হ্যাঁ, পার্ক সার্কাসের বাড়িটা চেনে। মনের পর্দায় অনেকগুলি অন্য রকম পুরুষ, মেহেদি করা চুল দাড়ি ভেসে ওঠে। যেতে পারে না। দু মাস কাটে, তিন মাস। প্রাণপণ চেষ্টা করে হাতের কাজে মন দিতে। গাইয়ে সুরকারদের ছাত্র-ছাত্রী হচ্ছে নিয়মিত উপার্জনের একটা উপায়। কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানিতেই ট্রেনার ছিল, বম্বেতে সময় ছিল না। এখন ভাবতে হচ্ছে। প্রথম সমস্যা বাড়ি। একটা স্থিতি না থাকলে কোথায় ছাত্র-ছাত্রী আনবে? বাংলা ফিল্মের এখন ভালো বাজার, একটার পর একটা হিট বই হচ্ছে। গানও হচ্ছে সব দারুণ। সেগুলোর মধ্যে তার গানও আছে। তবে বেশি নয়। তার কি বাজার আর নেই? না না, সে তো গত দশ-পনেরো বছরের বাংলাগানে সবচেয়ে বেশি হিট গানে সুর দিয়েছে, কে না জানে। কাজীদা বলতেন 'মাধুর্য হচ্ছে তোর সুরের বিশেষত্ব, আর বিষাদ। এমনকী তোর স্বদেশী গানও করুণ রসের, বলিদানের হাহাকার।' লোকে কি ভুলে গেল? রাতে ঘুম আসে না। কতক্ষণ জেগে থেকে শেষরাতে চোখ জড়িয়ে আসে।

সকালে ওঠে এক রাশ ক্লান্তি নিয়ে। কী হলো মালিকার? তার জীবনে কি নারীর মঙ্গল স্পর্শ, সন্তানের কলকাকলি চিরকাল স্বপ্নই রয়ে যাবে! দাদা-দিদি সকলের বিয়ে বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করেই হয়েছে। চিরাচরিত প্রথায়, দিব্যি সকলে সংসার করছে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করছে, বিয়েথা দিচ্ছে।

হাতে একটা পারিবারিক মামুলি ছায়াছবির সুর দেওয়ার কাজ। সকালে স্টুডিয়োতে বেরোতে যাবে। হরি জানালো এক অপরিচিত ভদ্রলোক দর্শনপ্রার্থী।

'বল এখন সময় নেই, আমি এখুনি স্টুডিয়োতে বেরিয়ে যাচ্ছি, বিকেলে আসুন।'

'না, বলছেন, জরুরি দরকার।'

'জিজ্ঞেস কর, কোথা থেকে আসছে। আর শর্মাকে গাড়ি বের করতে বল', অমল রেডি হয়।

'দাদাবাবু, বলছেন ঢাকা থেকে আসছেন।'

'ঢাকা! শিগগির ভিতরে নিয়ে আয়, যা যা।'

অমল প্রায় লাফ দিয়ে বৈঠকখানায়। হরির পিছন পিছন ঢোকেন বছর ৩৬/৩৭ এর এক পুরুষ, লম্বা চওড়া চেহারা, পরনে টাই বিহীন কোট প্যান্ট। অমলের সাগ্রহ অভ্যর্থনার উত্তরে সোফার ধারে পশ্চাদ্দেশ ঠেকিয়ে বসেন। গম্ভীর মুখ, আড়ষ্ট ভাবভঙ্গী।

'আমি সৈয়দ নাসিরুদ্দিন খান। মালিকা আমার ছোটো বোন। আপনি তো অমল সেনগুপ্ত? আপনার সঙ্গে আমার আরজেন্ট কথা আছে। আপনাকে টাইম দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। এক মিনিট, আমি একটু স্টুডিয়োতে বলে দিই আমার যেতে দেরি হবে।'

পাশে ছোটো অফিস ঘরে টেলিফোনে কথা বলা হয়ে গেলে, হরিকে চা-টা আনতে নির্দেশ দিয়ে বৈঠকখানায় ফেরে। সৈয়দ নাসিরুদ্দিন তেমনই কাঠের মতো বসে।

'হ্যাঁ, এবারে বলুন।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে মালিকার রিস্তা আমাদের কাছে একটা বিরাট প্রবলেম। গানাবাজনা আমাদের সোসাইটিতে তেমন চলে না। ভাই-বোনদের মধ্যে মালিকা সবচেয়ে ছোটো, আম্মিজান আব্বাজান দুজনেরই খুব আদরের। আম্মি গানা ভালোবাসেন, মালিকা তাঁর মতো হয়েছে, তাছাড়া ওর গানের গলাও আছে, তাই মালিকাকে কলকাতায় কাজী সাহেবের কাছে নিয়ে আসা। মালিকাকে মডার্ন সিংগার বানাতে চান। কাজী সাহেব বেমারে পড়লেন, আপনি তাঁর সাকরেদ, আপনার নিজের নামডাক আছে, মালিকার তালিম নেওয়া, রেকর্ড করা চলল। কিন্তু তাই বলে শাদি! ইম্পসিবল। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান শাদি ইসলামে জায়েজ নয়। আপনি কি জানেন না? বয়স তো আপনার যথেষ্ট হয়েছে।'

'অবশ্যই জানি। মালিকাকে আমি বলেও ছিলাম। আপনাদের আপত্তি খুবই সঙ্গত। আমার কোনো পালটা বক্তব্য নেই।

'হরি ঢোকে, ট্রেতে চা-টা নিয়ে। অমলের ইঙ্গিতে নাসিরের সামনে নীচু টেবিলে চায়ের কাপ ও সঙ্গে ছোটো প্লেটে কিছু কুচো নিমকি ও দুটি গজা ও এক গ্লাস জল রাখে।

'এক্সকিউজ মি, আমি কিছু খাবো না। সকালে নাস্তা করে বেরিয়েছি।'

'প্রথম দিন আমার বাড়িতে এলেন আপনি মালিকার ভাইজান, একটু মিষ্টিমুখ তো করবেন। আর চা তো সবই সময়েই চলে। ও আপনি খান না, বেশ, হরি চা টা তুলে নিয়ে যা। নিন মিষ্টিটা অন্তত খান।'

একটা গজা পুরো টপ করে মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতেই ঢক করে এক চুমুক জল খান নাসির। তারপর বলেন, 'আপনি ইমানদার, আপনার কাছে থেকে এমন জবাবই আশা করেছিলাম।'

অমল আলোচনায় ইতি টানতে উঠে দাঁড়াতে যায়। আমার কথা খতম হয়নি, অমলবাবু। অনেক বাকি।

আর কী কথা থাকতে পারে? ঠিক আছে, বলুন।

আসল কথাটাই তো বলা হয়নি। মালিকা ঢাকায় ফিরে শাদির কথা যখন বলল তারপর কী হলো—

আম্মুর কাছেই মালিকা প্রথম বলে। আম্মু বিশ্বাসই করতে পারেননি। যদিও লেড়কারা মালিকার শাদির ইন্তেজাম করার জন্য কবে থেকে বলে আসছিল, কয়েকটা প্রপোজালও এসেছে, আম্মু কানেই তুলতেন না। তাঁর কাছে মালিকা গুড়িয়া, সেই ছোট্টটি আছে। যখন সেই ছোট্ট মেয়ে নিজের মুখে শাদির কথা তুলল, তখন হঠাৎ আম্মু এক্কেবারে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। 'বেশরম মাইয়া, তবে নিশ্চয় হিন্দুটা নষ্ট করসে, তাই এখন শাদির কথা বলতাসে হারামজাদা,' ইত্যাদি।

মালিকা জোর গলায় বলে চলে, 'তিনি আমাকে কখনো স্পর্শ করেন নাই। নষ্ট করার প্রশ্ন ওঠে ক্যামনে। আর শাদির প্রস্তাব আমি দিসি, উনি নয়।

আম্মু তো খেপে গেলেন, 'হায় আল্লাহ, কী বেতমিজ মাইয়া, আমার নসিবে তুমি কী লিখস। এর চাইয়া তুই মইরা গ্যালেও ভালো সিল। আমাগো গোটা খানদানের নাক কাটসস।'

ঠাস ঠাস করে চড়চাপড় মারতে থাকেন। মোটা শরীর, প্রেশার আছে, নিজেই হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে যান। মালিকার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্বিকার মুখ পাথরের মূর্তি। তখন সন্ধ্যাবেলা, আব্বু আর নাসির বাড়িতে চেম্বারে, উকিলদের রাত অবধি কাজ চলে, বাড়িতে চেম্বার রাখতে হয়। তাদের ডেকে পাঠান, তারা সব শোনে। 'তোমার নয়নমণির শখ শোন। নিজের ওস্তাদ ওই হিন্দু অমল সেনগুপ্তরে শাদি কইরতে চায়। নিজেই ঠিক করসে।

নাসির বলে ফেলে, 'আমরা ভাইয়েরা কবে থিক্কা অর কইলকাতা যাওয়া, গান করা হেই সবে আপত্তি কইরা আসতা সিলাম, আপনাগো অতিরিক্ত আদরে আইজ হেই অবস্থা। হকল আবদার আপনারা মাইন্যা নিয়া, অ্যাখন বোজেন ঠেলা।

আব্বুর মাথায় হাত। তাঁরও বয়স হয়েছে, হার্টের অসুখ, ডায়বেটিস আছে। তবে এতদিন ফৌজদারি কেসে ওকালতি করেছেন, চট করে ঘাবড়ান না। মালিকাকে বলে দিলেন হিন্দুর সঙ্গে শাদির প্রশ্ন ওঠে না। অমল সেনগুপ্তর সঙ্গে তার আর কোনও রকম সম্পর্ক রাখা চলবে না। দেখাসাক্ষাৎ চিঠিপত্র কিচ্ছু নয়, ঢাকা ছেড়ে কোথাও এক পা যেতে পারবে না। মালিকা কোনো উত্তর না দিয়ে স্টোর রুমের মতো একটা ছোট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দিক। আগেকার দিন হইলে অবাধ্য মাইয়ারে বাপই হেইরকম ঘরে বন্দি কইরা রাখত। বরাবরের জইন্য, কোনো দিন খুইলত না।' আব্বুর সাফ বক্তব্য।

'ক্ষুধা পাইব না? পিপাসা? কতক্ষণ থাইকব। আপনে খুইল্যা বাইর হইব,' আম্মু নিশ্চিন্তে যোগ করেন। খিদেতেষ্টা পেল কিনা জানা নেই, তবে ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেল, দরজা খুলল না। তখন বাড়ির পুরনো নোকরানিকে পাঠিয়ে সাধাসাধি। কোনো সাড়া নেই। ভাইয়েরা দরজা ধাক্কালো, আম্মু আব্বু ডাকাডাকি করলেন। ভিতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। ওঁরা ঘাবড়ে গেলেন।

'মাথা গরম মাইয়া কিসু কইরা ফেলায়নি তো' আম্মুর গলায় কান্না

ভাইয়েরা দরজা ধাক্কিয়ে সমানে বলে যা, 'না খুইললে আমরা হেইবার দরজা ভাঙ্গুম।

তিন দিনের দিন মালিকা দরজা খোলে। আম্মু কেঁদে বলেন, 'তুই আমাগো এত আদরের মাইয়া, এ কী হাল হইসে, গোসল নেই, খানাপিনা নেই, মুখ চোখ বইস্যা গেসে। আরে, হেই ভাবে বাঁচন যায়? ক্যান অ্যামুন করতাছিস। তর কি পাত্রের অভাব? কত—

মালিকা বাধা দেয়, এ সব কথা শুনুম না। তোমরা চইলা যাও।

না খাইয়া মানুষ বাঁচে?

আমি বাঁইচতে চাই না।

দ্যাখ, পৃথিবীতে কত পুরুষ কত স্ত্রীলোক। কত রকম সম্পর্ক হয়, ভাইঙ্গা যায়। তার জইন্য কারও পরান যায় না।

কোনো উত্তর নেই তখন নাসির বলে, শোন দরজা বন্ধ কইরা দানাপানি বন্ধ কইরা কি সমস্যার সমাধান হইব? আয়, সকলের সঙ্গে উঠা বসা কর। আমি কথা দিতাসি একটা উপায় করুম।

শেষে মালিকা বেরল। আব্বু আগেই বলে রেখেছিলেন, সকলে নরম্যাল থাকবে, শাদির কথা উচ্চারণ করবে না। তবে চিঠিটিঠি লিখলে কেউ যেন পোস্ট না করে, বাড়ির বাইরে যেন পা না দেয়। বাড়ির মেয়ে বাড়িতে থাকব, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, ভালোমন্দ খানা পাকানো শিখবে, সেলাইফোঁড়াই করবে। বাকি সময় কোরআন পড়ুক, ব্যস।

দিন যায়। প্রথম কয়েক দিন মালিকা ঠিক ছিল। যেন প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি একেবারেই কাম্য নয়। সে তো এ বাড়িরই মেয়ে, এতদিন সকলের কত স্নেহে যত্নে বেড়ে উঠেছে। সব ছেড়ে দেবে কী করে। দিন দশেক পর লম্বা চিঠি লেখে অমল বাবুকে। পোস্ট করতে পাঠায়। আব্বু আম্মির নির্দেশ মতো সে চিঠি ডাকবাক্সে যায় না, তাদের হেফাজতে চলে যায়। কোনো উত্তর স্বভাবতই আসে না। মালিকা উদ্বিগ্ন, চিন্তিত। আবার বম্বে চলে গেলেন না তো। ওইটা তার বড়ো ভয়। সেখানে কাজ আছে, খ্যাতি আছে, আছে শেফালি। পর পর আরও দুটো চিঠি লেখে। একই পরিণতি। কলকাতায় ট্রাংককল করবে তারও উপায় নেই। টেলিফোন চেম্বারে, সেখানে তার সাধারণত প্রবেশ নিষেধ। কেমন সন্দেহ হয়। এবারে চিঠি লিখে দারোয়ানের হাতে দিয়ে নজর রাখে, দেখি পোস্ট করতে যায় কি না। না, তার সোজা গন্তব্য হলো বাড়ির চেম্বার। আবার খানাপিনা ছেড়ে দিয়ে কোঠাবন্দি করে নিজেকে। আবার সাধ্যসাধনা। তার সাফ জবাব, 'এইভাবে আমি বাঁইচতে চাই না।'

এবারে পরিবারের সকলে এক হয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত,শর্তসাপেক্ষ সম্মতি।

'আমাদের ডিসিশান, একটা কন্ডিশানেই আপনাদের শাদি হতে পারে।'

'কী কন্ডিশান?'

'আপনাকে মুসলমান হতে হবে। তাহলেই আপনি মালিকাকে শাদি করতে পারবেন।'

অমল স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ হতবাক। তারপর কোনোক্রমে বলে, 'মালিকা জানে?'

'হ্যাঁ, জানে। ও একটা চিঠি দিয়েছে,' পকেট থেকে একটি খাম বের করে সামনের টেবিলে রাখেন।

'অমলবাবু, আব্বু আম্মুকে আমাদের শাদির ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছি। তাঁরা রাজি নন। শুধু তাই নয়, আমাকে আপনার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ কিচ্ছু নেই। না হবে গান, না সংসার। এ অবস্থায় আমার বেঁচে থেকে লাভ কী? ক' দিন খানাপিনা ছেড়ে ঘরবন্দি ছিলাম। শেষে সকলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এক শর্তে আমাদের শাদি হতে পারে, আপনাকে মুসলমান হতে হবে।

আপনি তো বলেন আপনার কেউ নেই, আপনি একা মানুষ। কাজেই আপত্তি ঝগড়া ইত্যাদির ভয় নেই, ফ্যামিলির

জমিজমা তো সবই গেছে, মুসলমান হলে আপনার হারাবার কী আছে? তাছাড়া জানেনই তো হিন্দু-মুসলমান বিয়েতে বরাবর হিন্দুরা ধর্ম ত্যাগ করে। নতুন কোনো ব্যাপার নয়। শাদি ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আর এঁরা রাখতে দেবেন না। আপনি মুসলমান না হলে শাদি হবে না। সে ক্ষেত্রে আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কোনো রাস্তা থাকবে না। আমার জীবন আপনার হাতে। ইতি মালিকা।'

অমল চিঠিটা পড়া শেষ করে খানিকক্ষণ নীরব। নাসির নীরবতা ভাঙেন, 'দেখুন, আপনাকে আমি ম্যান টু ম্যান একটা কথা বলি। আপনি একজন এস্টাব্লিশড হাইকাস্ট বেঙ্গলি হিন্দু, প্রচুর নামডাক আছে, নিজের সোসাইটিতে আপনার মেয়ের অভাব কী। আর মালিকার ওই সুইসাইড সব কথার কথা....'

কিন্তু আমি তাকে দশ-বারো বছর ধরে চিনি, এক আধ দিন নয়। খুব জেদি মেয়ে। যা করবে মনস্থ করে শেষ পর্যন্ত করে তবে ছাড়ে। ধরুন আমি মুসলমান হতে অস্বীকার করলাম, এ বিয়ে হলো না। আর ঈশ্বর না করুন যদি মালিকা কিছু একটা করে বসে? আমি কোনদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো? আপনারাই কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?'

নাসিরুদ্দিন খানিকক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করন, 'সেও ঠিক কথা। কী করবেন তাহলে?'

'আমাকে একটু সময় দিন, আমি তো এই প্রস্তাবের জন্য একেবারেই মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম না।'

'কিন্তু আপনি হিন্দু, মালিকা মুসলমান, এটা তো প্রথম থেকেই জানা।'

'আমাদের গানবাজনার জগতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব ধর্মের নারী-পুরুষ একসঙ্গে মিলে মিশে কাজ করি, ও সব কথা বড়ো একটা ভাবি না।'

নাসিরের মুখেচোখে অবিশ্বাসের ছায়া, আমরাও কোর্ট কাছারিতে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি কাজ করি। কিন্তু রিলিজিয়ন বাঁচিয়ে—

অমল উঠে পড়ে, 'দেখুন, আপনি কাইন্ডলি দুটো দিন আমাকে ভাববার সময় দিন—'

'আমার তো কেস আছে, টাইম নেই—'

'মালিকার চিঠিটা যদি নরম্যাল কোর্সে আগে ডাকে পেতাম তাহলে এতদিনে—'

'ঠিক আছে, আমি পরশু সকালে আসছি আপনার ফাইনাল আনসারের জন্য।'

কতক্ষণ হয়েছে, বড়োজোর আধ ঘণ্টা। তার মধ্যে পৃথিবী বদলে গেল। অমলের সব কেমন আবছা লাগে, যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে, এখনই জেগে উঠবে। সব আগের মতো হয়ে যাবে। হরি ঘরে ঢুকে আলতো হাতে এঁটো প্লেট নিতে নিতে বলে,' শর্মা গাড়ি বের করেছে, টিফিন দিয়ে দিয়েছি।' সম্বিত ফেরে অমলের। সেদিন স্টুডিয়োয় কাজ করে যেন যন্ত্রের মতো, মন কোথায়। বাড়ি ফেরে। এখন আর নিজের থেকে পালাবার রাস্তা নেই। কাকে বলবে?

দাদা-দিদিদের কাউকে? কী বলবে? কোন মুখে বলবে? যে মুহূর্তে মুসলমান হয়ে যাবে, তার অমল সেনগুপ্ত পরিচয় লুপ্ত, পরিবারের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। কোনোদিন কেউ কোনো পুজোয় তাকে ডাকবে না, প্রতিমা দর্শন করতে পারবে না, অঞ্জলি দেওয়ার অধিকার থাকবে না, তার এত ঘটার সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়ে যাবে, মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষ তার হাত থেকে আর জল পাবেন না, ভাগনি, ভাইঝিদের বিয়েতে তাকে সম্প্রদান করতে ডাকা হবে না, মরার পর তার দেহ অগ্নিশুদ্ধ হবে না, সারা বিশ্বে কোনো হিন্দু তার আত্মার তৃপ্তি কামনা করবে না। আরও কত, কত কী থেকে সে বঞ্চিত হবে।

না, সে তো আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালি। যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝায়, তার প্রতিদিনের জীবনে হিন্দু ধর্মের ভূমিকা তো শূন্য, পুজোআর্চা অনুষ্ঠান মাত্র; আত্মা, পরকাল ইত্যাদির চেয়ে বর্তমান এবং বাস্তব জীবনের মূল্য ঢের বেশি। সে কী চায়, একটি সংসার, স্ত্রী, সন্তান। যে কোনো ধর্মে স্বীকৃত, স্বাভাবিক এবং ন্যায্য গণ্য। ধর্ম পালটালে কী এমন ক্ষতি, অমল সেনগুপ্ত মানুষটা তো পালটাবে না। তার প্রতিভা খ্যাতি জনপ্রিয়তা, নিজের কীর্তি তার স্থায়ী মূল ধন, সোনার বাংলা ব্যাংকের গচ্ছিত সঞ্চয়ের মতো রাতারাতি উধাও হয়ে যাবে না। হারমোনিয়ামটা নিয়ে বসে। হাতে ক'টা গানে সুর দেওয়ার কাজ। কর্মই জীবন।

রাতে বহুক্ষণ ঘুম আসে না। আজকাল অনিদ্রা তার রোগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যথারীতি শেষরাতে চোখ লেগে এসেছে। কী ভারী পাথরটা, দু হাতে প্রাণপণে পাহাড়টায় তুলছে তুলছে, পারছে না, হাঁপ ধরে গেছে, বুক ফেটে যাচ্ছে, কোনোক্রমে ঠেলে চূড়ায় তুলেছে, দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, অমনি গড়গড় করে পাথরটা তলায় পড়ে গেল। আবার তুলছে, আবার, আবার.... 'না না না, আমি পারবো না।' কে চেঁচাচ্ছে। অমলের ঘুম ভেঙে যায়, সারা শরীর ঘামে ভেজা। আবার সেই বম্বের দুঃস্বপ্নটা। পিছু ধাওয়া করে কলকাতায় তাকে পাকড়ে ফেলেছে। এত দিন পর। হরি তার চীৎকার শুনেও আগের মতো আসেনি, বলেনি, কী হলো দাদাবাবু। আজকাল কেমন যেন সবসময় গোমড়া মুখ হরির। দারোয়ানটারও। কী যেন নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে, তাকে দেখলে চুপ করে যায়।

না, অমল এ সব নিয়ে চিন্তা করবে না। দাদা-দিদিদের কথাও ভাববে না। তার জীবনে তাদের কতটুকু ভূমিকা? দিব্যি নিজেদের ছেলেপুলে ভালো ভালো মানুষ করে বিয়েথা দিয়ে সুখে সচ্ছন্দে ঘরসংসারে ব্যস্ত। ছোড়দা পার্টিশানের পর এই এতটুকু ওয়েস্ট বেঙ্গলেই পোস্টেড হয়, ঘনঘন কলকাতায়

আসে রাইটার্সে কাজের অছিলায়। শ্বশুর বাড়িতে ছেলে মেয়েকে রেখে ভালো স্কুল কলেজে পড়িয়েছে, মেয়ের ভালো বিয়েও তারাই সম্বন্ধ করে দিয়েছে। অমলের সঙ্গে কতই দেখাসাক্ষাৎ হয় আজকাল? বম্বে থেকে আসার পর থেকে তার তো অমলের বাড়িতে থাকা উঠেই গেছে। কলকাতায় এলে খালি টেলিফোনে খোঁজখবর। ব্যস, ওইটুকু। সে-ই বা আর কত একলা জীবন কাটাবে।

এখন তার একমাত্র লক্ষ্য নিজের একটি পরিবার, স্ত্রী, সন্তান। তাছাড়া মালিকা নিজে শিল্পী, সাধারণ মেয়ে নয়, ব্যক্তিত্বময়ী। অনায়াসে তার আদর্শ স্ত্রী হবে। ভারতীয় সংস্কৃতির পত্নী—গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ। এইতো শচীন দেব বর্মন, ত্রিপুরার রাজবাড়ির ছেলে মা মণিপুরের রাজকুমারী, মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালি মীরা দাশগুপ্তকে বিয়ে করে রাজপরিবার থেকে কার্যত বিতাড়িত। তাতে কী এসে গেছে। স্ত্রীটি আদর্শ সহধর্মিণী, শুধু গৃহিণী নন, আক্ষরিক অর্থেই প্রিয়শিষ্যা ইত্যাদি সবই। চমৎকার গীতিকার, তাঁর কথায় শচীন দেবের সুরে ও গলায় অপূর্ব সব গান, একদিন ক্ল্যাসিক হয়ে যাবে। অমল ঠিক করতে চলেছে।

।। নয়।।

যথা সময়ে নাসিরুদ্দিন খানের আগমন ও অমলের ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ। তার ইচ্ছামতো মালিকা কলকাতায় এলেই আনুষ্ঠানিক কলমা পড়া হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শাদির অনুষ্ঠান, বাহুল্য বর্জিত ইত্যাদি পরবর্তী পদক্ষেপগুলি। উকিলের উপযোগী বাস্তবোচিত ভঙ্গিতে আলোচনা। অমল মুখে বলে না কিন্তু মনে মনে ভাবে মালিকার পরিবার মুসলমান সমাজে ব্যতিক্রম। এইতো বম্বেতে বিখ্যাত সুন্দরী গায়িকা অভিনেত্রী সুরাইয়া আর অভিনেতা দেব আনন্দের প্রেমের কী পরিণতি হলো। ক'বছর ধরে দেব ও সুরাইয়া ঘর বাঁধতে চান। সুরাইয়ার পরিবার শুধু নয়, গোটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির যত হেভিওয়েট মুসলমান ব্যক্তিত্ব ছিল সব এককাট্টা হয়ে তাদের বিয়ের প্রস্তাবে এমন জোর আপত্তি করতে লাগলেন যে নরম চরিত্রের সুরাইয়া পরিবারের বিরুদ্ধে যেতে পারলেন না। দেব পিছু হটতে বাধ্য হলেন। আর বেচারি সুরাইয়া কুমারী রয়েছেন মনোকষ্টে। মনোকষ্ট থেকে দেহের অসুখ, ধীরে ধীরে ফিল্মজগতে, গানের দুনিয়ায়, সর্বত্র হতে চলেছেন প্রান্তিক। এমন আরও কত দৃষ্টান্ত হয়তো আছে, আমাদের অজানা। তুলনায় মালিকার পরিবার অনেক উদার, মানবিক। তাঁরা তো অন্তত একটা মীমাংসার কথা বলছেন। আর হিন্দুরা যে বরাবর মুসলমান বিয়ে করে ইসলাম গ্রহণ করে, সেটাতো সত্যি কথা। অমল প্রায় কৃতজ্ঞ বোধ করে।

বিখ্যাত গায়ক সুরকার অমল সেনগুপ্তের মুসলমান হয়ে আমিনুল হোসেন নামে নবপরিচিত এবং উদীয়মান নজরুলগীতির শিল্পী মালিকা খাতুনের পরিণয়ের খবর কোনও অজ্ঞাত কারণে বাংলা সংবাদপত্র এমনকী ফিল্ম পত্রিকাগুলি পর্যন্ত ছাপল না। অমল একটু বিস্মিত। সবচেয়ে বিস্মিত নিজের বাড়িতে। নববধূর সঙ্গে নিজগৃহে প্রথম রাত্রি যাপনের পর দিন সকালেই তার প্রথম আঘাত। সকালে অনেক ডেকে ডেকে হরির আবির্ভাব,' কীরে চা কি হলো, দু'কাপ মনে আছে তো।'

'আনছি। একটা কথা ছিল। আমি আজ দেশে চলে যাব। ওখানে অনেক ঝামেলা চলছে।'

'সে কী রে! ক'দিনের জন্য?'

'বলতে পারছি না।'

'মানে, ইয়ার্কি হচ্ছে? কথা নেই বার্তা নেই এরকম হুট করে ছুটি তুই কবে নিয়েছিস? চাকরি করার ইচ্ছে আছে কি না?'

'না, নেই। আপনি নিজে মুখে কথাটা পাড়লেন, ভালোই হলো। এখানে কাজ আমার আর পোষাচ্ছে না। হিসেবটা মিটিয়ে দিন। আমার বাক্সবিছানা গোছানো হয়ে গেছে। আপনাকে চা দিয়ে আমি চলে যাব।'

অমল একেবারে স্তম্ভিত। সেই প্রথম সংসার করা থেকে হরি তার কাছে আছে, ১৫/১৬ বছর তো বটেই কী বেশি হয়ে গেছে, তার সঙ্গে বম্বেও গেছে, আজ ১৫টা কথাও না বলে কাজ ছেড়ে দিল। তারপর চোট, শান্তির মা, ঠিকে ঝি। আজ থেকে কাজ করবে না, দারোয়ান ভজনলালকে বলে গেছে। এ ক'দিনের মাইনে মাসকাবারে এসে নিয়ে যাবে। আর ভজনলালই-বা কী, এই বাড়ি নেওয়া ইস্তক আছে, আজ বলল আর নোকরি করবে না, গাঁও ফিরে গিয়ে খেতি করবে, সাহাব যতদিন না নয়া লোক পাচ্ছেন তত দিন থাকবে তবে তাকে আলাদা রুপিয়া দিতে হবে সে খানা বাইরে খাবে। বছর খানেকের পুরনো ওড়িয়া ঠাকুর খোলসা করেই বলে 'বাবু, আমি ব্রাহ্মণ, এ ঘরে রসুই করতে পারব না। আজই আমার দরমাহটা মিটিয়ে দিবেন।'

এতক্ষণ মালিকা নীরব দর্শক। এবার মুখ খোলে, 'আমার জন্য এরা কাজ করবে না। কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমি সব সামলে নেব। অমলবাবু, আপনি আপনার কাজ করুন। বাড়ির দায়িত্ব আমার। 'মালিকা শাদির পরও 'আপনি' আর 'অমলবাবু' ছাড়তে পারবে না বলে দিয়েছে। তার সব কিছু বরাবর এক রকম থাকা চাই।

টালিগঞ্জে গিয়ে অমল দেখে সব আগের মতোই আছে, যেন নতুন কিছুই ঘটেনি এমন সকলের ভাবভঙ্গি। মন্দের ভালো। স্বস্তি বোধ করে। তবে খবরটা যে লোকমুখে যথেষ্ট প্রচারিত তার প্রমাণ সপ্তাহ খানেকের মধ্যে। বড়দার ক্রুদ্ধ গর্জন,

Ganesh®
SINCE 1936
PURE SPICES
এসে গেল
গণেশ
মশলা
HALDI POWDER
JEERA POWDER
DHANIA POWDER
LAAL MIRCH POWDER
KALI MIRCH POWDER
No added Colour
TURMERIC
CUMIN
RED CHILLI
BLACK PEPPER
গণেশের সেই purity, এবার মশলাতেও ফাটাফাটি
SCAN TO BUY
Ganesh@Doorstep or whatsapp 8100754242
Toll-free No.: 1800 1210 144 | Email at: info@ganeshgrains.com
www.ganeshgrains.com | www.ganeshkart.com

'এই বয়সে শেষে এক মুসলমান মেয়ে বিয়ে করে পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করতে তোর এতটুকু বাধল না! আমি ভাবতে পারছি না আমরা এক বাবা-মায়ের সন্তান। বংশের নাম ডোবালি, আমাদের কাছে তুই মৃত জেনে রাখ।'

দিদির কান্না, 'তুই মায়ের কত আদরের ছেলে ছিলি, কলকাতায় ওস্তাদদের কাছে তোর গানের তালিমের জন্য বাবাকে কত বলাকওয়া করত। কী গর্ব ছিল তুই যখন নাম করলি। ভাগ্যিস মা বেঁচে নেই।'

ছোড়দার ধিক্কার, আচ্ছা, তুই কি চারিদিকে কী ঘটছে দেখতে পাস না? পূর্ববঙ্গ মানে পাকিস্তান থেকে ইসলামের নামে হিন্দুদের ওপর কী অত্যাচার চলছে, কুকুর বেড়ালের মতো খেদাচ্ছে চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি থেকে, এক জন দুজন নয়, লাখলাখ। আর তুই সেই দেশের একটা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে পরিবার, সমাজ, সংস্কার সব ত্যাগ করলি? কী, এ সব রাজনীতির কথা! তুই শিল্পী? অন্য জগতের লোক? তোর কস্মিনকালে বাস্তবজ্ঞান ছিল না, আজও নেই। শুধু গান নিয়ে জীবন চলে না। কপালে তোর অনেক দুঃখ আছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

মনে হয় তার চারিদিকে যেন ধোঁয়া ধোঁয়া, কোনো কিছু স্পষ্ট নয়। কাউকেই সে চিনতে পারছে না। সে নিজেই কি এক

আছে! অমল সেনগুপ্ত কথা বলছে, নাকি আর কেউ। সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে হঠাৎ প্রচণ্ড পেটে ব্যথা। ডাক্তার আসে, কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে রোগী।

'এই অবস্থায় মরফিন ছাড়া রিলিফ হবে না।' ইঞ্জেকশান দেন।

'এখন ফায়ার ফাইটিং, তাই ইঞ্জেকশান দিতে হলো। কিন্তু এটা চিকিৎসা নয়। অমলবাবু, ডিটেল ইনভেস্টিগেশান দরকার।'

'সে দেখা যাবে, পরে।'

আঃ কী আরাম, কোনো যন্ত্রণা নেই, নেই কোনো দুঃস্বপ্ন। শান্তি। ঘুম ভাঙে যেন একটা মোলায়েম ঘোরের মধ্যে।

'এ পাড়াতে আমাদের থাকা সম্ভব নয়, চলুন, পার্ক সার্কাসে একটা আস্তানা খুঁজি।'

সুস্থ হলে মালিকার প্রস্তাব।

'তুমি হলে গৃহিণী, তোমার সংসার। যা ভালো মনে করবে কর। আমার কিছু বলার নেই।'

মালিকার বাপের বাড়ির পাড়ায় একটা যেমনতেমন আস্তানায় আমিনুল হোসেনের নতুন সাকিন। নতুন জীবন শুরু। প্রথমেই টাকার চিন্তা, নতুন কাজ তেমন কই। হ্যাঁ, রয়্যাল্টির টাকা পায় বই কী। তার সংগীত প্রতিভা বহুমুখী, ভাণ্ডার বিশাল। তার নিজের গাওয়া গান ছাড়া আধুনিক পল্লীগীতি, ভজন গীত, গজল, কাওয়ালি কত রকম গান বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে তার সুরে রেকর্ড হয়েছে। আজও হয়। টালিগঞ্জেও কাজ পায়, তবে মামুলি সেকেলে ধাঁচের ছবিতে। সেগুলি সাধারণত লো বাজেট ফিল্ম। অথচ বাংলা সিনেমার এখন স্বর্ণযুগ, একের পর এক দুর্দান্ত বাণিজ্য সফল কত ছায়াছবি। উত্তম-সুচিত্রা জুটির এক একটা ছবি সারা দেশ মাতাচ্ছে, হিন্দি, তামিল, তেলুগু সংস্করণ পর্যন্ত হয়। কোনোটার সুরকার অমল সেনগুপ্ত নয়। আচ্ছা, টালিগঞ্জ কি তার মুসলমান হওয়ার জন্য অপ্রসন্ন? এর মধ্যে জনা দুয়েক প্রডিউসার কন্ট্রাক্ট তৈরির সময় নিরীহ মুখে প্রশ্ন করেছেন, 'কী নামে চুক্তি হবে অমলবাবু, অমল সেনগুপ্ত না অন্য কিছু?'

'অমল সেনগুপ্ত,' গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছে। খুব অপমানিত বোধ করেছিল। পরে যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, প্রশ্নটা তো স্বাভাবিক, মুসলমান হওয়ার সময় নতুন নাম নিয়েছে, সে তো এখন আমিনুল হোসেন, আর অমল সেনগুপ্ত নয়। হিন্দু ধর্ম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু পরিচিতিও বর্জিত। কেমন অদ্ভুত লাগে, সে যদি অমল নয়, তাহলে তো শূন্য, একটা জিরো। না, না, তাকে আমিনুল হতেই হবে।

কারণ আমিনুলের সংসার হয়েছে, সন্তান হয়েছে, অমল সেনগুপ্তের হয়নি। পর পর দুটি ছেলে এবং শেষে তার কামনা পূর্ণ করে একটি মেয়ে জন্মেছে। জাহির উদ্দিন, কামাল উদ্দিন ও আমিনা। তাদের কলকাকলি, দুষ্টুমি, আদর আবদার, রোগবালাই সবই পিতৃত্বের অভিজ্ঞতা। তার সঙ্গে ক্ষুদ্র পরিসর ক্রমবর্ধমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সৃজনের প্রয়োজনীয় একান্ত পরিবেশে বাধা। কাজের একাগ্রতায় বিঘ্ন। ঢাকা থেকে আনা বিলকিস ওরফে হামিদা বানু কলকাতায় স্থায়ীভাবে তাদের সংসারে কাজ করতে অস্বীকার করে ঢাকা ফেরত চলে গেছে। এখন মিঞা বিবির সংসার। গেরস্থালি থেকে বাচ্চা মানুষ। 'মালিকা, দেখ জাহির এত চেঁচাচ্ছে কেন,' বা 'এই যে দুই ভাই আবার মারামারি করছে, মালিকা ওদের নিয়ে যাও,' 'আরে আমিনা পড়ে গেছে, চোট লাগল নাকি দেখো। প্রায়ই মালিকার বিরক্ত উত্তর, 'আমি রান্না করছি, আপনি একটু উঠে সামলান।'

দীর্ঘ দিন অমলের নিজের ঘরে, একান্ত নিরিবিলি পরিবেশে সংগীত সাধনা, সুর দেওয়া, সংক্ষিপ্ত স্বরলিপিতে লিখে ফেলা ইত্যাদি চলেছে। এখন আমিনুলের সে অভ্যাস ব্যাহত। তাই কি আগের মতো তেমন দারুণ সুর আর দিতে পারছে না। হঠাৎ চারিদিক যেন আবছা হয়ে যায়। সব অচেনা, জাহির উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, আমিনা — অমল সেনগুপ্তের কে হয়।

প্রতিদিন সকালে জলখাবারে মুখের সামনে পরোটা দেখলেই তার খিদে চলে যায়। কলকাতায় স্থায়ী হওয়া থেকে তার অভ্যাস, টোস্ট মাখন, ডিমপোচ, কলা। গরমের দিনে দই-চিঁড়ে, আম। খেতে বসে রোজ আজকাল খিটখিট করে ফেলে অমল। প্রাণটা চায় একটু সুক্তো, সোনামুগের ডাল, আলু-পটোলের ডালনা, হালকা রুইমাছের ঝোল। কতদিন খায়নি। মালিকা বিরক্ত,' এত বছর তো ওড়িয়া হাতের রান্না দিব্যি খাচ্ছিলেন, সে কি আমার চেয়ে ভালো রাঁধত। 'তার তো জানা নেই কলকাতায় ওড়িয়ারা বাঙ্গালি রান্না শেখে, একেবারে এক্সপার্ট হয়ে যায়। মায়ের হাতের রান্না তো স্বপ্ন, সে ধরে না, কিন্তু তার নিজের বাসায় বালেশ্বরের ঠাকুর বা মেদিনীপুরের হরি, সবাই মুখের সামনে ধরেছে বাঙ্গালির প্রতিদিনের মেনু। তেতো বা শাকভাজা, হালকা পাঁচমিশালি/ ডালনা/ চচ্চড়ি, মাছের ঝোলঝাল, মাঝে মধ্যে মালাইকারি বা পাতুরি। আর এখন তরকারি বলতে সব সময় ছালনা না কী, তারপর মাংস, কেবল মাংস। ছোলার ডালে নারকেল টুকরো নয়, থাকে মাংসের পিস, (প্রায়ই গোমাংস বলে মনে হয়)। মাছের ঝোল সর্বদা কালিয়া টাইপের এক স্বাদ। সবচেয়ে অসহ্য 'হালিম', আর এদের ফেভারিট 'কালা ভুনা'। এতটুকু খেলে দু দিন খিদে থাকে না। আমিষ নিরামিষ নির্বিশেষে সব পদে প্রচুর পেঁয়াজ রসুন। আবার আলাদা ভাজা পেঁয়াজও কখনো কখনো থাকে। আগে রান্নাবান্না নিয়ে এত মাথা ঘামাত না। জানা কথাই বাঙ্গালি বাড়ির পদ রান্না হবে। এখন ডালটাও নিজের রুচি মতো পায় না। অবিবাহিত জীবনে রাজার মতো থেকে এখন গৃহী হয়ে সে

প্রান্তিক। এদিকে অভাবের সংসার। মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তার ভার, নিয়মিত রোজগারের ব্যবস্থা কী করে হবে। তার মধ্যে থেকে সেই পেটে ব্যথা আর তার জন্য মরফিন। ডাক্তার বার বার কত রকম টেস্ট করাতে বলছেন, এভাবে মরফিন ব্যবহার উচিত নয়। কিন্তু অমল কানে তোলে না। মালিকাও তোলে না, এখন তার মনপ্রাণ সংসারে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত। যেটুকু অবসর পায়, নিজের গান নিয়ে বসে। তখন অমলবাবুকে দরকার। যেমন দরকার টাকার বেলায়। ভাগ্যিস, অমলের কাছে গান ও ফিল্ম জগতের লোকজনের যাতায়াত খানিকটা বজায় আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা আড্ডায় স্বস্তি, যেন পুরনো নিজেকে খুঁজে পায়। কিন্তু সংসার বাড়ছে, খরচ বাড়ছে, উপার্জন বাড়ছে না। তার দুশ্চিন্তা কম নয়।

‘অমলবাবু, ঢাকায় এখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। ‘মুখ ও মুখোশ’ দারুণ বই ছিল। ‘বেহুলা’, ‘ভানুমতি’, ‘আপন দুলাল’, ‘মধুমালা’, এসব পপুলার বই তো হচ্ছেই। নতুন বাজার, আপনার মতো সেলেব্রিটি ওখানে কোথায়। আপনি গেলে ওরা লুফে নেবে। আমার বিশ্বাস ওখানে আপনার বম্বে কলকাতার চেয়ে অনেক অনেক বেশি নাম হবে।’

‘কী নাম? অমল সেনগুপ্ত না আমিনুল হোসেন? কী নাম হবে আমার ঢাকায়?’ বলেই ফেলে একদিন।

‘ নামে কী এসে যায়। কাজই সব। আমার বিশ্বাস কলকাতা বম্বেতে আপনি যত কাজ করেছেন বা এখন করছেন....ছুরিটা বেঁধাতে ভোলে না....ঢাকায় তার চেয়ে কিছু কম পাবেন না।’

কিন্তু ঢাকায় কি আদৌ কলকাতার মতো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে। বরিশাল, পাবনা, সিলেট, চাঁটগাঁ থেকে অসমের প্রমথেশ বড়ুয়া, পঞ্জাবের কুন্দনলাল সাইগ, লাখনউয়ের তালাত মাহমুদের মতো গুণী পাওয়া যাবে। পারসি থেকে মাড়োয়ারি কত অবাঙ্গালির অবদান কলকাতার সিনেমায়। আর বাঙ্গালিদের প্রতিভার কথা তো ছেড়েই দেয়। তারা তো সারা ইন্ডিয়াতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পায়োনিয়ার। হিমাংশু রায়, দেবিকারাণীর কথা না হয় বাদই দিল। এখনকার দেবকী বসু থেকে অগ্রদূত গোষ্ঠী, ট্যালেন্ট সব তো পশ্চিমবঙ্গে, বম্বেও এদের সেলাম করে।

‘পূর্ববঙ্গে কস্মিনকালে এ ধরনের কালচার ছিল না। ঢাকাতে কিছু উর্দু ফিল্ম হয়েছে—

‘মালিকা বাধা দেয়,’ পশ্চিমবঙ্গে কি চিরকাল ছিল? নাকি রাতারাতি এই কলকাতায় হয়ে গেছে। এখানেও তো প্রথমে ছোটো করেই আরম্ভ করতে হয়েছিল।’

দেখ, আমি নিজের চোখে এই ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠতে দেখেছি। শুধু কলকাতায় নয়, বম্বেতেও। সেরা ট্যালেন্ট পেতে হলে বড়ো পরিসর চাই। দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন জাতের গুণী মানুষকে কাছে টানবার প্রতিভা চাই। সে রকম পরিস্থিতি বা মানসিকতা কি ঢাকার আছে? না কি কোনোদিন হতে পারবে?

আপনাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা বদ্ধমূল ধারণা ইন্ডিয়া ছাড়া  কোনো কালচার হয় না। কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ হচ্ছে সব কিছুর সেন্টার, গানবাজনা ফিল্ম। একবার চলুন না, নিজের চোখেই দেখবেন হয় কী হয় না। অসুবিধা কী। এখানে তো নিজের ঘরদুয়ার কিছুই নেই। বরং পাকিস্তানে গিয়ে খুলনার জমিজায়গা ঘরবাড়ি উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারবেন।’

শুধু একবার বলেই ক্ষান্ত হয় না, সমানে লেগে থাকে। আরও যুক্তি যোগ হয়। ঢাকায় জীবনযাত্রা কলকাতার তুলনায় সস্তা, খানপরিবারের গাঁয়ের জমিদারি থেকে কিছু না কিছু পাওয়া যাবে, পাকিস্তানে গরিব পথে-ঘাটে, কাজের লোকের অঢেল জোগান, দুটো খেতে দিলে দিনরাত পায়ে পড়ে থাকে, বাচ্চাদের দেখভালের লোকের অভাব কী, গরিব বিধবা ফুফা কী খালা থাকে। আর কলকাতায় একেই সব নগদে কিনতে হয় তার ওপর কলকাতায় বাঙ্গালি এলাকায় যেমন কাজের লোক পাওয়া যায়, রিপন স্ট্রিট বা পার্ক সার্কাসের মতো পাড়ায় আদৌ তেমন নয়। নোকর যদিও বা মেলে, সারা দিনের নোকরানি তো পাওয়াই যায় না, একা হাতে তিন ছেলে-মেয়ে মানুষ, রসুই থেকে শুরু করে কি না করতে হচ্ছে, খেটে খেটে তার জান কাবার। গানের জন্য কতটুকু সময় দিতে পারে?

অপরাধী বোধ করে অমল। সত্যি স্বামী হয়ে মালিকাকে এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখাতে পারল না। সংসার চেয়েছে কিন্তু সংসার পালনের কর্তব্য করছে কতটুকু? তাছাড়া সে তো শুধু মালিকার স্বামী এবং তার সন্তানের পিতা নয়, সংগীত গুরুও। সেই ন’বছরবয়স থেকে তাকে নিজে হাতে গড়ে তুলেছে। রেওয়াজের বদলে শুধু ছেলে-মেয়ে মানুষ আর ঘরের কাজেই যদি দিন যায় তাহলে তাদের বিয়ের কী মানে! তার দিকটাও ভাবতে হবে। হ্যাঁ, তার জন্য দরকার হলে তিন দশক ধরে যে মাটি তার প্রতিভাকে লালনপালন করেছে, দিয়েছে খ্যাতি, জনপ্রিয়তা, অর্থ, একাধিক সম্মাননা, সে মাটি থেকে শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। সবকিছু গোছগাছ করে যখন তারা প্রস্তুত তখন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে অমল সেনগুপ্তকে আট হাজার গান রেকর্ডের অনন্য কীর্তির জন্য স্বীকৃতি ও সম্মান জানানো হলো। যেন বিদায়োন্মুখ পুত্রকে মাতার শেষ স্নেহাশিস। না, অমল তবু থাকবে না। অন্য মাটিতে নতুন করে শিকড় গজাতে হবে। হলোই-বা সে দেশের নাম এখন পাকিস্তান, একদা তো তার পূর্ববঙ্গ, জন্মভূমি বলে কথা!

ঢাকার সঙ্গে অমল বা তার বাড়ির কারও তেমন সম্পর্ক ছিল না। বরং পশ্চিমে নদীয়া, কলকাতা বা পূর্বে কুমিল্লা এমনকী  অসমের সঙ্গে যোগাযোগ যাতায়াত ছিল, কেউ না কেউ সে সব জায়গায় বিয়েথা করেছে বা চাকরি সূত্রে বসবাস করত। অতএব ঢাকায় পদার্পণে মালিকার বাপের বাড়িই হলো

*শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—*

# বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শাড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

# প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

*স্থাপিত - ১৮৬২*

**বড়বাজার ঃ** ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ৭০৪৪০৯২০০০
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ৮৪২০০৭০৯৫৯

**গড়িয়াহাট ঃ** ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ৭০৪৪০৮৮৪০৮

**কাঁচড়াপাড়া ঃ** ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

**বারাসত ঃ** ৫৬, কে এন সি রোড, হরিতলা, ফোন ঃ ৭০৪৪০৫০১৩৭
*এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মেদিনীপুর।*

*With Best Compliments From :*

# ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
# AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
# ALL INDIA PACKERS & MOVERS

***ADMINISTRATION OFFICE :***

**1A, Raja Subodh Mullick Square, (5th Floor) Kolkata-700013**
**Phone : 2237 5919 / 2090 / 2822**
**Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779**
**E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com**
**Web-site : www.allindiatpt.com**
**(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)**

**TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER TRUCKS AVAILABLE.**
**SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.**
**SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)**

**BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA**

তাদের প্রথম ঠিকানা। ততদিনে তার আব্বু গত, আম্মু মেদ ও বাতে অথর্ব। সংসার ভাই ও ভাজদের। এতদিন তাকে ভাবা হতো বাড়ির বেয়াড়া মেয়ে কলকাতায় হিন্দুকে শাদি করেছে, তাকে মুসলমান করে, যা হোক সকলের মুখ রক্ষা হয়েছে। বরং নামডাকওয়ালা দামাদ নিয়ে পরিবারে কিঞ্চিৎ গর্বও ছিল। এখন তারা বালবাচ্চা নিয়ে ঢাকায় এসে হাজির যেন হাড়হাভাতে বিহারি রিফিউজি, সঙ্গে টাকায়পসার সংস্থান যৎসামান্য। এখানে এসেই কি না কামকাজের খোঁজ! সকলের সামনে নাক কাটা। হায় আল্লা! অমলদের অল্পদিনের মধ্যেই আলাদা বাসায় উঠে যেতে হলো। প্রথমেই আবিষ্কার কলকাতার চেয়ে ঢাকা আদৌ সস্তা নয়। দেশভাগ ও দাঙ্গা ইত্যাদিতে দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত। এদিকে প্রতিদিনের জীবনে দরকারি সব কিছু প্রচুর দাম, সবই ভারত থেকে আমদানি করতে হয়। লাইফবয় সাবানটা পর্যন্ত। আর খান পরিবারের গাঁয়ের জমি বাবদ আয় বা ফসল? সে গুড়েবালি। ব্রিটিশের করা জমিদারিপ্রথা ভারতের মতো এখানেও তুলে দেওয়া হয়েছে। বিধবা গরিব ফুফাখালা তাদের মতো ইন্ডিয়া থেকে রিফিউজির মতো আসা পরিবারে আশ্রিতা হয়ে মাগনা খাটতে আসবে কোন দুঃখে। তবে গ্রাম থেকে সস্তায় কাজের মেয়ে জুটল।

এবার মালিকার চেষ্টায় ঢাকার চলচ্চিত্র জগতে উঁকি ঝুঁকি, লোক মারফত, মানী লোক অমলবাবু তো নিজে যেতে পারেন না।

'অমল সেনগুপ্ত ক্যাডা?'

'গাইন করে, সিনেমায় সুর দেয়।'

'কইলকাতা বোম্বাইয়ে ঢের নাম করসে।'

'ওই যে মালাউনটা, খান বাড়ির দামাদ। মালিকারে শাদি করনের লইগ্যা কলমা পড়সে। আমিনুল হোসেন হইসে।'

'হালা গয়সাল, আমাগো মাইয়া কবজা কইরা শান্তি নাই, আমাগো ফিল্মে ছড়ি ঘুরাইতে আইসে।'

দিনের পর দিন কাটে। কাজ জোটা দূরের কথা, কাজের কোনো আলোচনা করার লোকের পর্যন্ত টিকিটি দেখা যায় না। কেউ কোনো অনুষ্ঠানেও তাকে গাইতে ডাকে না। বরং মালিকা ইসলামি গান কী কাওয়ালি গাইবার আমন্ত্রণ পায়। হ্যাঁ, অমলের কথা সে তোলে বই কী। ভদ্রতার খাতিরে দু'একজন বলেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো সেলেব্রিটি, ওঁর নাম ইন্ডাস্ট্রিতে কে না জানে, সে রকম সুটেবল ফিল্ম হাতে আইলে নিশ্চয়ই ওঁর কথা ভাবুম।

ওই পর্যন্তই। সুটেবল ফিল্ম আর হয় না। রেডিয়োতে কোনো প্রোগ্রাম পায় না, কোনো আসরে ডাক পড়ে না। কেউ কেউ স্পষ্ট বলেই দেন, 'জানেন তো পাকিস্তানিদের মেন্টালিটি, এগুলার গাইনবাজনার কালচারই নাই, তার উপর বাংলা গানের ইন্ডিয়ান সিঙ্গার হইলে তো বোজতেই পারতাসেন —'হ্যাঁ, বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। কিন্তু সে তো শুধু বাংলা নয়, উর্দু গীত গজলও গায়, সুর দেয়। তাহলে? উত্তর নেই। অমল সেনগুপ্ত / আমিনুল হোসেনের অস্তিত্বই ঢাকা স্বীকার করে না।

ঘিঞ্জি পাড়ায় এক চিলতে ফ্ল্যাটে বন্দি জীবন। এখন মালিকার হাতে সংসার। ভারত থেকে নিজের দেশ পাকিস্তানে ফিরে এসে রাতারাতি তার সব কিছু প্রায় পালটে গেছে। কলকাতায় এতকাল পশ্চিমবঙ্গের যে মান্য ভাষা ব্যবহার করে এসেছে, সেটা যেন আলগা পোশাক ছিল। ঢাকায় পা দিয়েই খুলে ফেলে দিয়েছে। অষ্টপ্রহর ঢাকাইয়া তার মুখের বুলি। অবশ্য ঢাকায় সকলের মুখের ভাষাই তাই। এটাই এদের প্রকৃত মাতৃভাষা। পশ্চিমবঙ্গের মান্য চলিত ভাষাটা কার্যত দ্বিতীয় ভাষা, মঞ্চে বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বা তার সম্পর্কিত কাজকর্মের জন্য তার সীমিত ব্যবহার, স্বাভাবিক। তেমনই স্বাভাবিক নমাজ পড়া। বিশেষত মালিকার আত্মীয়পরিজনের উপস্থিতিতে। একেবারে পাঁচ ওয়াক্ত না হলেও অন্তত বার দুয়েক, ফজরের নমাজ ও এশারের, অর্থাৎ সকালে ও রাতে। বাড়ির দামাদ যোগ দেয় না কেন? অমল সেনগুপ্ত তো হিন্দু থাকতে পালনীয় সন্ধ্যাহ্নিক কিছুই করত না এবং না করার জন্য কাউকে কখনো কৈফিয়ত দিতে হয়নি। আমিনুল হোসেনের সে স্বাধীনতা নেই। কিছুদিন খুব চেষ্টা করে চালিয়েছিল। তারপর দুত্তেরি ছাই বলে বন্ধ করে দিয়েছে।

মালিকার কাছ থেকে দূরত্ব আর একটু বাড়ল। তার চাপা ওষ্ঠাধর আরও যেন চাপা, ক্রমে একটি সরল রেখা। মিশেছে বিরক্তি, খুবই যুক্তিসঙ্গত। সব কাজের ভার তার ঘাড়ে। ভারত থেকে এসে পাকিস্তানে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা অতি দুরূহ কাজ। তাকেই অগ্রণী হতে হয়। ঢাকার রাস্তাঘাট যে তারই নখদর্পণে। অমলের একা কোথাও যাওয়া মানে মালিকাকে রাস্তার ডিরেকশান বোঝাতে এত প্রাণান্ত হতে হয় যে সে বিরক্ত হয়ে বাপের বাড়ির কাউকে সঙ্গে নিয়ে একাই চলে যায়। অমল তো কলকাতা, বম্বেতে গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে হুকুম করতেই অভ্যস্ত ছিল। এখন সাইকেল রিক্সায় বসে কাকে এবং কী ভাষায় হুকুম করবে। হিন্দি উর্দু অনায়াসে যে সড়গড় করে ফেলেছিল, এখন স্থানীয় বুলিতে হোঁচট খেয়ে যায়। আসলে শৈশব থেকে মায়ের মুখে শোনা মান্য বাংলা এমন মজ্জাগত হয়ে আছে যে ঢাকাইয়া থেকে সিলেটি, সব উপভাষাকে বাংলার ক্যারিকেচার মনে হয়। তবে মনের কথা মনেই থাকে। শুধু অসন্তোষ বাড়ে, আর বাড়ে তার একাকিত্ব।

মালিকার সামাজিক ব্যস্ততা বহু গুণ বেড়ে গেছে, তার নিজের রিস্তেদার সব কাছাকাছি। কলকাতায় একমাত্র আপা আর তার ছেলে-মেয়েরা ছিল, যাদের অমল আবার পছন্দ করত না। এখানে আর অমলবাবুর পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা করে না। যে মরদের কামকাজ নাই তার কী দাম। খুলনার জমিজায়গা কিছুই উদ্ধার হয় নি, সেটা অনেকদিন আগেই শত্রু সম্পত্তি

# LUXMI TEA CO. PRIVATE LIMITED

17, R. N. Mukherjee Road, Kishore Bhawan, Kolkata-700 001
Phone No. 2248 4437/4227, Fax No. 2243 0177
E-mail : mail@luxmitea.com, Web.: www.luxmigroup.in

GROUP GARDENS

NARAYANPUR T.E.
SHYAMGURI T.E.
MONMOHINIPUR T.E.
MANOBAG T.E.
BHUYANKHAT T.E.
MANU VALLEY T.E.
GOLOKPUR T.E.
PEARACHERRA T.E.
JAGANNATHPUR T.E.
SAROJINI T.E.
FULBARI T.E.
URRUNABUND T.E.
MAKAIBARI T.E.
KENDUGURI T.E.
MORAN T.E.
SEPON T.E.
ATTABARIE T.E.
LEPTKATTA T.E.
ADDABARI T.E.
DIRAI T.E.
MAHAKALI T.E.

LAUREL

***With Best Wishes From-***

**PRAKASH-PRAMOD BAID**

## Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES
PRIVATE LIMITED
(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY
(Chartered Accountants)

**909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001**
**Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341 Email ID - prakash_laurel@yahoo.com**

হিসেবে স্থানীয়দের কবজায়। ঢাকায় আমিনুল হোসেনের টাকার অভাব কলকাতার অমল সেন গুপ্তের চেয়ে ঢের ঢের বেশি। সেখানে আগের মতো রমরমা না হলেও কিছু না কিছু কাজ থাকত। তার কাছে সংগীতপ্রেমী লোকজনের যাতায়াতও লেগেই ছিল। নিজেকে কখনো ফালতু মনে হতো না, একটা অস্তিত্ব ছিল। এখানে সে শুধু নিষ্কর্মা নয়, একেবারে শূন্য। মালিকা যেন দেখেও দেখে না। ক্রমে কাজকর্ম নিয়ে আর কথাই বলে না। হ্যাঁ, তার নজরুল গীতি শেখার আজীবন পরিকল্পনার পূর্ণ রূপায়ণ সফল, অমলবাবুর ভাণ্ডার উজার হয়ে গেছে। দিনের পর দিন শুধু তালিমেই যেন টিকে ছিল দাম্পত্য সম্পর্ক।

নিঃসঙ্গ অমল হারমোনিয়াম নিয়ে বসে, অভ্যাসবশত। ছেলে-মেয়েদের ডাকে গান শেখাতে। প্রথমে ক্ল্যাসিকাল ধরায়, যেমন সে নিজে শিখেছিল। তারা দায়ে পড়ে দু'চার দিন বসে, উশখুশ করে, তারপর পড়াশোনার চাপের অজুহাতে বন্ধ করে দেয়। একদিন অমল বাজার থেকে ক'টা আম কিনে এনেছে, আমিনা বড়ো আম ভালোবাসে। তেমন জাতের আম নয়, চুষে খাওয়ার। 'আব্বু আম আনসে, আম আনসে', সানন্দ অভ্যর্থনা। ধুয়ে তার হাতে দিতে সাগ্রহে চুষে চুষে একেবারে আঁঠি ন্যাড়া। 'যাও, ওটা ফেলে দাও।' এক দৌড়ে আবর্জনায় ফেলে আসে আঁঠিটা আমিনা। 'বাহঃ লক্ষ্মী মেয়ে।' বাকিগুলো পরে খাবা, ভাইজানদের দেবে কী।

ক্রমে শৈশব অতিক্রান্ত। বড়ে  হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে অমল কেমন বাদ পড়ে যেতে থাকে।  এখন তাদের আদানপ্রদান শুধু মালিকার সঙ্গে। ফ্ল্যাটে তার জন্য বরাদ্দ ছোটো  ঘরটিতে সে আর তার হামমোনিয়াম, তানপুরা, বইখাতা। যে সংসার, স্ত্রী, সন্তান সে মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছিল, যার জন্য স্বজন, সমাজ, দেশ, ধর্ম সব কিছু ত্যাগ করল, সেই সংসার স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে।

খালি একটা জিনিস বেড়ে যায়। সেই পেটব্যথাটা। টাকা পেলেই অমলের প্রথম কাজ হলো যথেষ্ট মরফিন ট্যাবলেট কিনে রাখা। কলকাতার ডাক্তারের কাছ থেকে একাধিক ব্র্যান্ডের মরফিন ট্যাবলেটের নাম লিখে এনেছিল, একটা না পাওয়া গেলে অন্যটা আনবে। আরও ঘন ঘন ব্যথা। আর আরও বেশি মরফিন। সত্যি কথা বলতে কী মরফিন খেয়েই একমাত্র শান্তি পায়। কয়েক ঘণ্টা গভীর ঘুম আর একটা মোলায়েম ঘোরের মধ্যে থাকা। মেঘের মধ্যে ভাসছে হালকা শরীর। ইদানীং প্রায়ই দেখে মেঘের মধ্যে দুরে আবছা একটা মূর্তি, পরনে লালপাড় মটকা শাড়ি, পিঠ ছাপানো খোলা চুলের তলায় গিঁট বাঁধা, কপালের সিঁদুরের টিপ থেকে একটু গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়েছে কি নাকের ডগায়? হাতে পিতলের সেই পদ্মকাটা প্রসাদের রেকাবিটা না? মা, মা, এই যে আমি এখানে। সে এগিয়ে যেতে থাকে, মা মা। মূর্তি কাছে আসতে আসতে ধীরে ধীরে ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়। মেঘের মধ্যে সে একা ভাসছে।

জেগে ওঠে, মালিকার কর্কশ কণ্ঠে। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই আগেকার মধুকণ্ঠী মালিকা, যে মালিকা তার অমলবাবুর নজর কাড়ার জন্য, তাকে খুশি করার জন্য, তার মন দখল করার জন্য দিনের পর দিন বছরের পর বছর উঠেপড়ে লেগে থেকেছে, দিস্তা দিস্তা চিঠি লিখেছে, স্বেচ্ছায় যেচে তার বাড়িতে এসেছে। হ্যাঁ, তার দুঃখের সময়, বিপর্যয়ের সময় পাশে থেকেছে, সান্ত্বনা দিয়েছে, জুগিয়েছে ভরসা। সেই মালিকা আজ কোথায়! অভাবে কি স্বভাব নষ্ট হয়? অভাব তো কলকাতায়ও ছিল। হ্যাঁ, হরদম কথাকাটাকাটি হয়েছে। এখন তাও হয় না। মাঝেমাঝে এক তরফা দু'একটা মন্তব্যে দোষারোপ। বেশিরভাগ সময় নির্ভেজাল অবহেলা। অমলের তো মালিকার প্রতি মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। বম্বে থেকে কলকাতায় ফেরার দিন থেকে মালিকার সুস্পষ্ট সান্নিধ্য প্রত্যাশার আবেগ তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। শেফালির সঙ্গে সম্পর্কের কানাগলি থেকে বেরতে সে তখন মরিয়া। তার কাছে মালিকা এক নতুন জীবনের হাতছানি। হ্যাঁ, একটা দেনাপাওনার হিসেব উপলব্ধিতে ছিল বই কী। মালিকার বালিকা বয়স থেকে সংগ্রামের লক্ষ্য গায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ এবং সে জন্য তাকে বড়ো প্রয়োজন। সে প্রয়োজনের কাছে অমল সেনগুপ্তের ধর্ম, পরিবার, সমাজ, দেশ, সব কিছুই তুচ্ছ। এখন আমিনুল হোসেনকে নিয়ে সে তার নিজের মুসলমান সমাজে, ইসলাম ভিত্তিক পবিত্র বা 'পাক' স্থানে। জীবন যুদ্ধে সে বিজয়িনী। অমল সেনগুপ্তের সব ঐশ্বর্য তার দখলে। পরাজিতকে কবে কে খাতির করে! আজকাল মালিকা তীব্র তীক্ষ্ণ — 'মরদ হইয়া রোজগারের চেষ্টা নাই, খালি মরফিন, অটা তো ন্যাশা হইসে।' ছেলে-মেয়েরা মায়ের কথাবার্তা শোনে, ব্যবহার দেখে, শেখে। সত্যি তো তাদের আব্বু আর পাঁচজনের মতো অফিস, কাছারি, কোর্ট কিছুই করে না। সে এখন আমিনার আবর্জনার গাদায় ফেলে দেওয়া আমের আঁঠি, তার সব রস চুষে নিঃশেষে ভোগ করা হয়ে গেছে।

দিন যায়, মাস যায়। বছরের পর বছর কাটে। হ্যাঁ, পূর্ব পাকিস্তানে খুব অশান্তি অসন্তোষ বিক্ষোভ। বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে। কত কবিতা গান হয়ে রচনা হয়ে গেল। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র সুর করলেন আলতাব মাহমুদ। 'জয় জয় বাংলা'র সুর দেন আনোয়ার পারভেজ। কোনো গানের সুর দিতেই অমল/আমিনুলের ডাক পড়ল না। ডাক পড়ে না কোথাও গাইতে। মালিকার প্রচুর চাহিদা। দিকে দিকে গানের দল নিয়ে 'জয় জয় বাংলা' গেয়ে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশ হলো। অতীতের পাকিস্তানের মতোই বর্তমান বাংলাদেশেও অমল/আমিনুল রয়ে

গেল অপাঙ্‌ক্তেয়, ব্রাত্য। রেডিয়োতেও তার প্রোগ্রাম হয় না। কোনো অনুষ্ঠানেও না। মালিকার চারিদিকে ডাক পড়ে। এমনকী অসুস্থ রুদ্ধবাক অপ্রকৃস্থিত নজরুলকে ঢাকায় এনে বাংলাদেশের জাতীয় কবি আখ্যা দিয়ে ঘটা করে ধানমণ্ডিতে বাড়িটাড়ি দিয়ে যখন রাখা হলো যেখানে মালিকা খাতুনের সম্মানিত বহুবিজ্ঞাপিত সদা উপস্থিতি। অথচ যে মানুষটি নজরুলের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য, তার কণ্ঠ সেখানে শোনা গেল না।

বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে খুব গঙ্গা পদ্মা দহরম মহরম চলছে। এক দিন কলকাতা থেকে আনা কয়েকটা বইয়ের একটা প্যাকেট বাড়িতে এল। খবরের কাগজের কভারটা মালিকা খুলে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। অমল তুলে নেয়, পুরনো একটা বাংলা দৈনিক। খবরে দেখে শচীনদেব বর্মন ভারত সরকার দ্বারা সম্মানিত। কাগজে ফলাও করে তাঁর এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ডজন খানেক পুরস্কার ও সম্মাননার ফিরিস্তি দিয়েছে। প্রতিভাময়ী স্ত্রী মীরা ও সুযোগ্য পুত্র রাহুলের কার্যকলাপেরও বিস্তারিত উল্লেখ করতে ভোলেনি। কাগজটা ভাঁজ করে রাখে। অমল সেনগুপ্ত আর শচীনদেব বর্মন দুজনেই পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে এসে একই যুগে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। একই কর্মকাণ্ডে প্রতিভার বিকাশ। তারপর? শচীনদেব ভারতকে বেছে নিয়ে অর্জন করেছেন আসমুদ্রহিমাচল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা, একসুরে বাঁধা স্ত্রী-পুত্র সহ সম্মানিত সার্থক জীবন, আর মালিকার জন্য ইসলাম গ্রহণ করে পাকিস্তান- বাংলাদেশকে বেছে নিয়ে অমল হয়েছে আমিনুল, একাকী, শূন্য।

কিছু একটা করতেই হবে, হ্যাঁ, যে কোনো কাজ। যে কোনো। পুরুষমানুষ বলে কথা! শেষ পর্যন্ত করে। মুদির দোকান খোলে। ৪০-এর দশকে তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া অমল সেনগুপ্ত, মন্বন্তরের সময় দিনের পর দিন কাঙালি ভোজন করানো অমল সেনগুপ্ত, বুইক চড়া, সোনার বাংলা ব্যাংকে বহু অর্থ গচ্ছিত রাখা মূল্যবান ক্লায়েন্ট, কলকাতা বম্বের রঙিন দুনিয়ার অন্যতম যাদুকর অমল সেনগুপ্ত শেষ জীবনে হলো মুদি আমিনুল হোসেন।

একদিন কী করে কে জানে একটি তরুণ সাংবাদিক হঠাৎ তাকে আবিষ্কার করে ফেলে। 'আপনি বিখ্যাত সুরকার গায়ক অমল সেনগুপ্ত, এভাবে? মুদির দোকান দিয়েছেন। কেন?'

'পেট তো চালাতে হবে।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' সশ্রদ্ধ তরুণটি সবিনয় প্রশ্ন।

'না। আমার কিছু বলার নেই।'

কতদিন চলল হিসেব নেই। আর সময়ের খেয়াল রাখে না। কোনো কিছুরই খেয়াল রাখে না। খেয়াল রাখে শুধু মরফিন ট্যাবলেটের। প্রায়ই আজকাল দরকার হয় কিনা। আজ আবার ব্যথাটা খুব বেড়েছে। মরফিনেও শানাচ্ছে না। মেয়ে আমিনা উঁকি মেরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আব্বু, কী হইসে? এমন করতাস ক্যান?'

কোনোক্রমে মুখ দিয়ে আওয়াজ, 'বড়ো কষ্ট।'

আমিনা এক দৌড়ে আম্মুর কাছে, 'আব্বুর বড়ো কষ্ট হইতাসে। ডাক্তার ডাকন লাগব।'

মালিকা বেরোচ্ছিল, তার অনুষ্ঠান আছে। 'ট্যাবলেটের ন্যাশা। খাইলে কইম্যা যাইব।'

মানুষের জীবন পদ্মপত্রের জল। ডাক্তার, বদ্যি, হাসপাতাল, নিকটজনের সেবা, সবই বাহুল্য। অমল সেনগুপ্তের অবসান হলো বাহুল্যবর্জিত। শেষকৃত্য কবরখানায়। শুধুমাত্র পরিবারের ক'জনেরই উপস্থিতিতে দাফন দেওয়া হলো। পরিচয়ে লেখা, 'আমিনুল হোসেন, জন্ম, খুলনা ১৮১২, মৃত্যু, ঢাকা ১৯৭৪'।

পরবর্তীকালে সংগীতের ইতিহাসের কৌতূহলী কেউ গুগল সার্চ করলে দেখবেন, 'অমল সেনগুপ্ত, প্রসিদ্ধ বাংলাদেশি সুরকার ও গায়ক, আমিনুল হোসেন নামে সমধিক পরিচিত।'

*[কাহিনিটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোনো বাস্তব চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য কাকতলীয়। কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্র পটভূমির প্রয়োজনে ব্যবহৃত, তাঁদের সঙ্গে কাহিনির বাস্তবিক কোনো যোগ নেই।]*

**Kedia Fabrics**

**Kamal Kumar Kedia**

**Mfg. & Dealer of Fancy Sarees**

**160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,**

**Kolkata-700 007**

**(s) 2272-5487**

**Mob : 9331105467**

# যুগ-ত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

*সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।*
*নমোহস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।*

একটি রূপক ঃ দ্রুতগতির একটি ট্রেন। দুর্যোগপূর্ণ এক রাতের অন্ধকারে ছুটে যাচ্ছিল গন্তব্যের দিকে। হঠাৎ চালক দেখতে পেলেন দূরে একটি আলোকবিন্দু আন্দোলিত হচ্ছে। চলকের মনে সন্দেহ হলো। তিনি ট্রেনটির গতি কমালেন ও আলোর কাছে ট্রেনটিকে থামালেন। সামনেই দেখতে পেলেন রেললাইনটির উপরে পড়ে রয়েছে এক মূলোৎপাটিত মহীরুহ। জনৈক সুহৃদ আলো হাতে রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে চালককে ইঙ্গিতে এই বিপদবার্তা জানিয়ে ট্রেনটিকে রক্ষা করলেন। ঊনবিংশ শতকের সভ্যতার অগ্রগতির রথটিও এমনি করে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলছিল। আর তার সামনে পড়েছিল পাহাড়প্রমাণ এক শক্ত বাধা। যার সঙ্গে সংঘাতে এ রথটি একটু পরেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু জনৈক সুহৃদ পূর্বসংকেতে রথটিকে থামিয়ে এটিকে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন। আমাদের কথিত এই

রূপকের সুহৃদটি আর কেউ নন। তিনি যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ। আর রথ-সম্মুখস্থ ওই সুমেরুবৎ বাধাটি হলো আধুনিক ভোগবাদ ও জড়বাদ। যার প্রত্যক্ষ প্রকাশ কাম ও কাঞ্চনের রূপ ধরে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। বস্তুত, এই কাম ও কাঞ্চনই এ যুগের দুই মহাপরাক্রান্ত অসুর। যুগত্রাণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কঠোর-কঠিন সাধন-সমরের মাধ্যমে এই দুই অসুরকে বধ করে অধ্যাত্ম মহিমার প্রতিষ্ঠা করলেন ও বর্তমান যুগের মানুষকে ত্রাণ করেছিলেন। এ কাজ সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি প্রথমে জগজ্জননীর অকালবোধন করলেন।

অকালবোধন ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দীর্ঘ সাধনায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রথমে মৃন্ময়ী ভবতারিণীকে চিন্ময়ী রূপে জাগ্রতা করলেন। বস্তুত, তিনি দেবীর অকালবোধন করলেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে চলছিল তাঁর তপস্যা ও সাধনা। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সাক্ষাৎ জগন্মাতাকে অন্তরে অধিষ্ঠিত করে তিনি পরম শান্তি লাভ করলেন। কিন্তু তীব্র অনুভূতিশীল শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল নিজে শান্তি লাভ করে শান্ত হতে পারলেন না। তিনি এ শান্তি অশান্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই ভবতারিণীকে অবলম্বন করে ভগবানের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর তিনি মানুষের সাধনায় মগ্ন হলেন। আর তাই দেখি তিনি ভবতারিণীকে লাভ করার জন্য যত না কেঁদেছেন তার চেয়ে অনেক গুণে বেশি কেঁদেছেন নরেন্দ্র, গিরীশ আর গৌরীমা-র জন্য। এই নরেন্দ্র, গিরীশ ও গৌরী—মায়েরা আর কেউ নন। এরা বর্তমান বিশ্বের তাপিত মানুষের প্রতিনিধি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মানুষের সাধনায় নিমগ্ন হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন এই নরেন্দ্র, গিরীশ ও গৌরীমায়েরা সকলেই স্বরূপত ভগবান। 'জীব ব্রহ্মৈব নাপর'। কিন্তু এরা নিজেদের যথাক্রমে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, মদ্যপ নাট্যকার এবং নিছক একজন দুর্বল নারী বলে মনে করছে। এদের সামনে রয়েছে বর্তমান যুগের ভোগবাদ ও জড়বাদের হাতছানি। একবার যে বা যারা এই মহা আকর্ষণীয় ও দুর্নিবার ভোগবাদের হাতছানির দিকে তাকিয়ে মোহিত হয়ে সেদিকে এগিয়ে যায় তার আর পরিত্রাণ নেই। রাতের পতঙ্গগুলি অগ্নিকুণ্ডের আলোকে মোহিত হয়ে দ্রুতগতিতে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেমন প্রাণ বিসর্জন দেয়, তেমনি বর্তমান ভোগবাদ ও জড়বাদের আকর্ষণে যে বা যারা তার দিকে ছুটে যায় সে বা তারা নিশ্চিত ধ্বংসকেই আলিঙ্গন করে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে এ যুগের মূল দুই অসুরকে চিহ্নিত করে তাদের স্বরূপ সম্যকরূপে অনুধাবন করতে প্রয়াসী হলেন।

অসুর চিহ্নিতকরণ ও তাদের স্বরূপ নির্ধারণ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের মানুষকে ত্রাণ করবেন বলে স্থিরসংকল্প হয়েই এসেছিলেন। তাই তিনি দেবীর অকালবোধন পর্ব সম্পন্ন করে তাঁর সাধনার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করলেন। এই দ্বিতীয় পর্বের সাধনা হলো তাঁর মানুষ-সাধনা। এ সময়ে তিনি এ যুগের মানুষের সমস্যার মূল কারণ কী তা নির্ণয় করতে প্রয়াসী হন। এই প্রয়াস থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে বর্তমান বিশ্বের সমস্যাসমূহের মূলে রয়েছে কাম ও কাঞ্চন। বস্তুত, জগতে এমন কোনো সমস্যাই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা কোনো না কোনোভাবে কাম বা কাঞ্চনাশ্রয়ী নয়। আধুনিক যুগের সূচনায় ফ্রয়েডীয় ভাবনা ও মার্ক্সীয় ভাবনা সমাজে প্রবল প্রভাব ফেলেছে। আর এই ফ্রয়েডীয় ভাবনা ও মার্ক্সীয় ভাবনার মূলে রয়েছে যথাক্রমে কাম ও কাঞ্চন। তাঁদের মতে এ জগতে কাম ও কাঞ্চনই হলো সত্য। তাঁদের ভাবনায় জগতে যাবতীয় সুখের নিদান এ দু'টি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অভ্রান্ত সাধন সহায়ে উপলব্ধি করলেন কাম ও কাঞ্চন আসলে মিথ্যা। কাম ও কাঞ্চন এই দুটিরই প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু এ শক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ অতি ধ্বংসাত্মক। এই দুটিই আসুরিক শক্তিসম্পন্ন। এরা আপাত সুখ দান করলেও মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। বরং এরা মনের শান্তি কেড়ে নিয়ে মানুষকেই প্রায়শই অন্তর থেকে দেউলিয়া করে দেয়। এই আন্তরশূন্যতা এ যুগের মহা হাহাকার। আকুল ক্রন্দন। সব কিছু থেকেও কিছু নেই। ভিতর ফাঁকা, অন্তঃসারশূন্য। এই অন্তঃসারশূন্য মানুষগুলিকে উপদেশ দিলেও কোনো কাজ হয় না। যেমন মলয়ের বাতাস বইলেও বাঁশ কখনও চন্দন হয় না। কাম ও কাঞ্চন এই দুটি বস্তুই সুখ দান করবে বলে প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে প্রথমে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। নানা ছলনায়, নানা রঙে, নানা বাহানায় এরা মানুষকে প্ররোচিত করে এবং পরে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে নেয়। এরা দস্যু, এরা তস্কর। সেজন্য আমাদের দেশের সনাতন শিক্ষা ঃ

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ দেহে তিষ্ঠন্তি তস্করাঃ।
জ্ঞানরত্নমপহারি তস্মাজ্জাগ্রত জাগ্রত।।

(মহাসুভাষিতসংগ্রহ- ৯৫৬৯ক)

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ ভোগবাদের মোহে পড়ে নিজেদের সম্পূর্ণ বিপন্ন করে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন এই কাম ও কাঞ্চনরূপ দুই অসুরকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বর্তমান সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। তাই তিনি সাবধান করে বর্তমান যুগের মানবমানবীকে বললেন—''কামিনী-কাঞ্চনই মায়া। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁশ চলে যায়'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—অখণ্ড-৮০ পৃ.)। যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণের এ এক নব আবিষ্কার। আরও একটু বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের এই দুই প্রধান শত্রু ও সমস্যাকে শুধু চিহ্নিত করে দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করে দেননি। তিনি এই কাম ও কাঞ্চন-রূপ পরাক্রান্ত দুই রিপুর হাত থেকে নিবৃত্তির উপায়ও বলে গিয়েছেন।

**কামাসুর জয় ঃ** যুবক হরিনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন—''মশাই, কামটা একেবারে যায় কী করে?'' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—''যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না'' (শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা-১-ভাগ- স্বামী গম্ভীরানন্দ-৪৭০ পৃ, ৬ষ্ঠ সং-১৩৯০)। এতে হরিনাথ বুঝতে

পেরেছিলেন কাম জয় করার উপায় কেবল এই মহাশত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া নয়। এর জন্য প্রয়োজন মনকে ঈশ্বরমুখী করা। মন একান্তভাবে ঈশ্বরমুখী হলে আর চেষ্টা করে তাকে কাম-ভাব থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর অনুরাগে মন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে বিষয়ে বিরাগ আপনা থেকেই হয়ে যায়। কেউ যদি পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় তাহলে পশ্চিম দিক আপনা আপনিই দূরে প্রস্থান করে। আবার মিছরির পানা পেলে কারও চিটে গুড় ভালো লাগে না। মলয়ের বাতাস পেলে আর তালপাতার বাতাসের প্রয়োজন হয় না। হরিনাথ কামকে ঘৃণা করতে গিয়ে অপর এক বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন। তিনি কামের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নারী জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন। এমনকী কোনো বালিকা নিকটে এলে তিনি বলতেন ‘‘উঃ আমি তোদের হাওয়া সহ্য করতে পারি না।’’ কিশোর শিষ্যের এই ভ্রান্ত ভাবনা দূর করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তিরস্কার করে হরিনাথকে বলেছিলেন, ‘‘তুই বোকার মতো কথা বলছিস। নারীমূর্তিদের অবজ্ঞার চোখে দেখার কারণ কী? তারা জগন্মাতার মানবী মূর্তি। তাদের মায়ের মতো দেখবি ও শ্রদ্ধা করবি। তাদের প্রভাব হতে মুক্ত হবার এই হচ্ছে উপায়। তা না ক’রে যতই তাদের অবজ্ঞা করবি ততই ফাঁদে পড়বি’’ (বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পৃ–৭০-৭১, কার্তিক-১৩৯৪ সং)। এ কথা বললেও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন কাম যাবার নয়। কিন্তু কাম যাবার নয় বলে তার হাতে আত্মসমর্পণ করা আত্মহত্যার নামান্তর। তাই তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও পরম মমত্ব নিয়ে, তাদের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলছেন—‘‘এই কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় রিপু একেবারে তো যাবে না; তাই ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি কামনা করতে হয়, লোভ করতে হয়, তবে ঈশ্বরে ভক্তি করতে হয়, আর তাঁকে পাবার লোভ করতে হয়। যদি মদ অর্থাৎ মত্ততা করতে হয়, অহংকার করতে হয়, তাহলে আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের সন্তান এই বলে মত্ততা, অহংকার করতে হয়’’ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত- অখণ্ড-৪২৭ পৃ)।

স্বামী যোগানন্দকেও শ্রীরামকৃষ্ণ কাম জয় সম্বন্ধে এক অদ্ভুত পরামর্শ দান করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় এখানে সেকথার উল্লেখ করছি—ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—খুব হরিনাম করবি, তা হলেই (কাম) যাবে। কথাটা আমার একটুও মনের মতো হল না। মনে মনে ভাবলুম–উনি কোন ক্রিয়াটিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আমার কাম যায়—তাহলে এত লোক তো কচ্ছে যাচ্ছে না কেন? —তারপর ভাবলাম—উনি যা বলছেন তা করেই দেখি না কেন কী হয়? এই বলে এক মনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা-১ম ভাগ-স্বামী গম্ভীরানন্দ-১৬৪-১৬৫ পৃ, ৬ষ্ঠ সং-১৩৯০)। ভাগবতে এ সম্বন্ধে একট অপূর্ব শ্লোক আছে। এতে বলা হয়েছে :

কৃতে যৎ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।<br>দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ হরিকীর্তনাৎ।। ভাগবত-১২/৫/৫২

অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যাজযজ্ঞে এবং দ্বাপরে সেবাকর্মের মাধ্যমে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে তা হরিকীর্তনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানগণের জীবনে এ শাস্ত্রবাক্য কেবল পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ রইল না। তাঁদের জীবনে এ শাস্ত্রবাক্য সত্য বলে প্রমাণিত হলো। যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে কেবল আধুনিক যুগের মানব-মানবীকেই ত্রাণ করলেন না, তিনি আক্ষরিকভাবেই লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রেরও ত্রাণ করলেন। তাই যথার্থতই তিনি মানবত্রাতা, তিনি যুগত্রাতা, তিনি শাস্ত্রত্রাতা। এই নাম জপের মহিমা সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে চন্দ্রসূর্যাদয়ো গ্রহাঃ।<br>অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।।

–মহাসুভাষিতসংগ্রহ-১২৭১৯

অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যাদি গ্রহ অস্ত গিয়ে আবার ফিরে ফিরে চলে আসে। কিন্তু দ্বাদশ অক্ষর সংবলিত মহানাম জপকারী ব্যক্তির কখনও আর এ সংসারে ফিরে আসতে হয় না। তার মুক্তি হয়ে যায়। এই দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট মহামন্ত্রটি হলো—‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’; যা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর নিকট ‘ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়’ বলে উচ্চারিত হতে পারে। এই নাম জপের মধ্য দিয়ে কাম জয় সহজ হয়।

জনবিস্ফোরণ বর্তমান বিশ্বের এক কঠিন সমস্যা। আর অপর এক প্রাণক্ষয়ী ব্যাধি হলো এইড্স। আমরা একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারব এই উভয় যুগ-সমস্যার উৎস একটিই। আর এই উৎসটি হলো কামের প্রশ্রয়। মানুষের যথেচ্ছ ও অনিয়ন্ত্রিত কামস্পৃহা আজ বিশ্বসভ্যতাকে ধ্বংসের দোরগোড়ায় এনে উপস্থিত করেছে। যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে বারবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান গর্বিত ভোগবাদী সমাজ এ কথায় কর্ণপাত করেনি। তাই আজ আধুনিক সভ্যতার এই ভয়াবহ পরিণতি। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বিবাহিত। তিনি বিশ্বপিতা। কিন্তু তিনি বিবাহিত ও বিশ্বপিতা হয়েও সাধারণ জৈবিক অর্থে জনক নন। লোকশিক্ষার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দেহসম্পর্কহীন এক দৈবী দাম্পত্য জীবন বিশ্বমানবের নিকট উপহার দিলেন। বিবাহিত নারী-পুরুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ— ‘‘কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না; দু-একটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই-ভগ্নীর মতো থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তাহলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়।

ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেন, যদি আন্তরিক হয় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত- অখণ্ড-১১১৯ পৃ)। নিজে দৈহিক সম্পর্কহীন একটি বিবাহিত জীবন যাপন করে সকলকে দেখিয়ে গেলেন তাঁর এ উপদেশ কেবল কথার কথা নয়। আন্তরিক হলে এ অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। বস্তুত, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও এইড্স দমনে এর চেয়ে কার্যকর উপায় আর দ্বিতীয় আছে কি? বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে মহাকাব্যের যুগে মহাভারতে বলা হয়েছে ঃ

আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাৎ ভার্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্।।
(মহাভারত–১-৬৮-৪৭, মহাসুভাষিতসংগ্রহ-৪৬১৯)

অর্থাৎ বুধজন জানেন পুত্রের জন্মের মধ্য দিয়ে পিতা নিজেই আবার জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পুনরায় নিজেরই জন্মগ্রহণের অর্থ (স্বামীর নিকট) স্ত্রী-র মাতৃস্বরূপ হয়ে যাওয়া। সেজন্য পুত্র জন্মের পর স্বামী স্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবেন। একথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হলেও আজ পর্যন্ত কোনো দেশের কোনো ব্যক্তির জীবনে এ উপদেশের বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে এই প্রথম এর বাস্তবায়ন সম্ভব হলো। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই শুধু অবতার নন, তিনি অবতারশ্রেষ্ঠ।

**কাঞ্চনাসুর জয় ঃ** কামের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় আলোচনার পর এবার কাঞ্চনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে পরামর্শ দিয়েছেন তা আমরা নিরূপণ করতে প্রয়াসী হব। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজকর্ম করতে গিয়ে আমরা দেখি সর্বক্ষেত্রেই টাকার প্রয়োজন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখি তিনি 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা' বলে টাকাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়েছেন। এই টাকাকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে তাঁর সেসময়ে দুর্ভাবনা হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য: ''তখন একটু ভয় হল। ভাবলুম, আমি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে। তখন হাজরার মতো পাটোয়ারী করলুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত–অখণ্ড, শ্রাবণ-১৪১০ সং; পৃ-৬৮৫)। আপাত কৌতুকের আড়ালে এটি বর্তমান যুগের মানুষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এক অতি মূল্যবান শিক্ষা। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান ভোগবাদী ও বস্তুবাদী বিশ্বের মানুষের যন্ত্রণা নিবৃত্তির এক পরম নিদান নির্দেশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলছেন তিনি পাটোয়ারী করেছেন অর্থাৎ চাতুরী করেছেন। আসলে 'সা চতুরী, চাতুরী' অর্থাৎ এই চাতুরীই যথার্থ চাতুরী। এ চাতুরী বস্তুত জীবের মায়াজাল ছিন্ন করে। তিনি এখানে সেই সাধকের প্রার্থনার উল্লেখ করলেন। যার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবতী বর দিতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধিমান সাধক বলেছিলেন : ''মা যদি বর দিবে, তবে এই কর যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-অখণ্ড, শ্রাবণ-১৪১০ সং-পৃ ৬৮৫) । এক বরেতেই সাধকের সন্তান, নাতি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যলাভ হলো। দেবী লক্ষ্মীকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করতে পারলে মানুষের আর কি অভাব থাকতে পারে? ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যেখানে অবস্থান করবেন সেখানে তো কোনো সম্পদেরই কোনোরূপ ঘাটতি থাকতে পারে না। এখানে একটি বিষয় আমাদের বিশেষভাবে বুঝতে হবে। যেখানে শুধু ধন থাকে সেখানে ধনের আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তা, লোভ, মোহ ইত্যাদি আবশ্যিকভাবে চলে আসে। কিন্তু যেখানে দেবী স্বয়ং


*শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনায় :-*

**A**

**Well Wisher**

*(KN3 )*

বর্তমান সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধন সম্পদ থাকলেও তা হয় এই দুশ্চিন্তা, লোভ ও মোহশূন্য। আবার বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যেতে পারে যে আসলে সব ধনই দেবীর। তিনি তাঁর ধন আমাদের কাছে কিছুদিনের জন্য গচ্ছিত রেখেছেন। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনে এই ধন আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু মনে মনে জানব এর কোনটির মালিকই আমি নই, এ সবই দেবীর। আর এ ধন যদি দেবীর হয় তাহলে আমরা কেন এর জন্য দুশ্চিন্তা করব? তখন জনকের মতো অবস্থা—'অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কশ্চন' (মহাভারত, শান্তি পর্ব) । অর্থাৎ অনন্ত সম্পদ থাকলেও এর কোনোটিই আমার নয়। মিথিলা নগরী পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও তা কোনোপ্রকারেই আমাকে দগ্ধ করে না। এখানে দেখব দেবীবর্জিত ধনই হলো আমাদের যাবতীয় দুঃখের কারণ, আর ধনের সঙ্গে দেবীকে ধরে থাকতে পারলে আর কোনো দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা থাকে না। সাপের মধ্যে বিষ থাকলেও তাতে সাপের কোনো ক্ষতি হয় না। বুড়ি ছুঁয়ে নিলে আর চোর হয় না। কোনোও প্রকারে যদি একবার দেবীকে অন্তরে আসীন করা যায় তাহলে আমাদের ধনও হয়, আবার শান্তিও আসে। কোনো কিছুরই আর অভাব হয় না। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র আমাদের ভোগ করতে নিষেধ করছেন না, কেবল ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করতে বলছেন। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যস্বিদ্ ধনম্।' ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ কর, কারও ধনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ো না। কিন্তু এটিই মানুষের জীবনের বিড়ম্বনা যে মানুষ প্রচণ্ড লোভের বশবর্তী হয়ে কেবল ধন চায়, ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে চায় না। আমাদের লোভ কত প্রবল এবং তা থেকে কেমন বিড়ম্বনা আসে তা বোঝা যাবে সেই ভিখারির কাহিনি থেকে। এক ভিখারি ভিক্ষা করে অতি কষ্টে দিনযাপন করত। তার দুরবস্থা দেখে ভগবান তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। ভগবান তাকে বললেন দুটি শর্তে আমি তোমাকে ধনী করে দিতে পারি। ভিখারিটি এতে খুব আনন্দিত হয়ে শর্ত দুটি জানতে চাইল। ভগবান বললেন প্রথম শর্ত—আমি তোমাকে বেশকিছু মূল্যবান মোহর দান করব। কিন্তু এ মোহর দান করার পর তুমি কারও কাছে আর কিছু চাইতে পারবে না বা ভিক্ষা করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, এ মোহর যেন মাটিতে ফেলবে না। কারণ এ মোহর মাটিতে পড়ে গেলে এগুলি ছাই হয়ে যাবে। ভিখারিটি ভগবানের দেওয়া শর্ত একবাক্যে মেনে নিল। ভগবান ভিখারিকে তার ভিক্ষার ঝুলির মুখটি খুলে ধরতে বললেন। সে তার ঝুলির মুখটি খুলে ধরার পর ভগবান তাতে মোহর ঢালতে শুরু করলেন। বেশ কিছু মোহর ঢালার পর তিনি থেমে গেলেন। ভিখারিটি তখন ভগবানের দিকে করুণ নেত্রে তাকিয়ে বলল—'আরও কিছু মোহর আমায় দিন।' ভগবান শুনে বললেন তুমি তোমার প্রথম শর্ত এত তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেললে? যাই হোক এবারে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমার ঝুলি কিন্তু খুব দুর্বল এবং এতে আর বেশি ধরবে না। তাছাড়া যে মোহর তুমি পেয়ে গিয়েছ এতেই তোমার অভাব দূর হয়ে অনেক উদ্বৃত্ত হবে। ভিখারিটি তবু বলল যেন তাকে আরও মোহর দেওয়া হয়। অগত্যা ভগবান পুনরায় ভিক্ষুকটির ঝুলিতে মোহর ঢালতে শুরু করলেন। কিন্তু ভিক্ষুকটি কিছুতেই তৃপ্ত হলো না ও ভগবানকেও নিরস্ত হতে বলল না। ভগবান সেই ঝুলিতে মোহর ঢালতেই থাকলেন। কিন্তু হায়, দেখা গেল দুর্বল ঝুলি মোহরের ভার আর সহ্য করতে পারল না। তাই একসময় ঝুলি ছিঁড়ে গিয়ে সব মোহরগুলিই মাটিতে পড়ে গেল। শর্ত অনুসারে মাটি স্পর্শ করা মাত্র সব মোহরগুলি ছাই হয়ে গেল। সেজন্য বলা হয় 'তণ্হায় জায়তে সোকো, তণ্হায় জায়তে ভয়ং। তণ্হায় বিপ্পমুত্তস্য নাত্থি সোকো কুতো ভয়ম্' (ধম্মপদ, পিয়বগ্গো-৮)। তৃষ্ণা বা বাসনাই হলো শোক ও দুঃখের কারণ। ইংরেজিতে একটি কথা আছে : Needs can be satisfied but greed cannot. অর্থাৎ মানুষ তার যা কিছু অত্যাবশ্যক প্রয়োজন তা সহজেই মিটাতে পারে কিন্তু তার লোভনীয় সামগ্রীর অভাব কখনও মিটাতে পারে না। যেমন পেট্রল ঢেলে কখনও আগুন নিভানো যায় না। ধন লাভ করতে হলে ধৈর্য ধরতে হয়। এই ধৈর্য সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত সুভষিতে বলা হয়েছে– শনৈ: পন্থা শনৈ: কন্থা শনৈ: পর্বতমস্তকে। শনৈর্বিদ্যা শনৈর্বিত্তং পঞ্চৈতানি শনৈ: শনৈ: ।। (সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম, সামান্যনীতি-১২৬)। পথ চলতে গিয়ে, কাঁথা সেলাই করতে গিয়ে, পর্বতারোহণ করতে গিয়ে এবং বিদ্যা ও বিত্ত লাভ করতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নেই। এ পাঁচটি বিষয় ধীরে ধীরে লাভ করতে হয়। ইংরেজিতে বলা হয় : Haste is waste. এছাড়াও বলা হয় : You get the chicken by hatching the egg, not by smashing. একটি মোরগছানা পেতে হলে ডিমটিকে ফুটতে দিতে হবে। এটিকে ভাঙলে চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ

বর্তমান যুগের মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যথার্থ শান্তি পেতে হলে প্রথমে ধৈর্য দেবীকে অধিষ্ঠিত করতে হবে। প্রথমে দেবীকে লাভ করা প্রয়োজন, পরে ধন আপনা থেকেই আসবে। সুন্দর উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন যেমন গ্রামের কোনো গরিব বাড়িতে জমিদার এলে তার সঙ্গে সেপাই-সান্ত্রী-সহ যাবতীয় ভোগ্যবস্তু আপনা থেকে চলে আসে। জমিদারের নিকট আলাদা করে ধনদৌলত ও ভোগ্যবস্তু চাইতে হয় না। এ জন্য প্রয়োজন শুধু জমিদারের প্রসন্নতা। আমরা যখন ধনের পিছনে ছুটে যাই তখন আমাদের চাঞ্চল্য আমাদের বারে বারে পথে হোঁচট খাওয়ায়। কিন্তু যদি ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে চলি তাহলে পথটি সুগম হয়। আমরা যদি কোন প্রজাপতি ধরতে তার পিছনে ছুটতে থাকি তাহলে সে শাখা থেকে শাখান্তরে উড়ে যায়। আর যদি আমরা শান্ত হয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাই তাহলে এক সময় সেই প্রজাপতিটি নিজে থেকেই এসে আমাদের কাঁধে বসে। আর এই ধীরতা আসে ঈশ্বরের স্মরণ- মননের মধ্য দিয়ে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। আমাদের দেশের তন্ত্রশাস্ত্রও ধন ও সম্পদ লাভ করতে নিষেধ করছেন না।

গৃহস্থকে বিদ্যা, ধন, যশ ও ধর্ম এই চারটি জিনিস যত্নের সঙ্গে অর্জন করতে বলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলছেন তিনটি জিনিস পরিহার করতে। এই তিনটি জিনিস হলো, বিলাসিতা, অসৎ সঙ্গ ও মিথ্যাদ্রোহ। মূল উপদেশ বাক্যটি হলোঃ বিদ্যা ধন যশো ধর্মান্ যতমান উপার্জয়েৎ। ব্যাসনাঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ।।" (মহানির্বাণতন্ত্র-৫/৫৮)। শ্রীরামকৃষ্ণও সংসারযাত্রা নির্বাহ করার জন্য সংসারীদের ধন উপার্জন করতে নিষেধ করেননি। তিনি বরং সংসারীকে ধন উপার্জন করে সম্ভাব্য দুঃসময়ের প্রয়োজনে তার কিছুটা সঞ্চয় করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর নিজের কথা: ''সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা মাগ ছেলে আছে। তাদের জন্য সঞ্চয় করা দরকার, মাগ ছেলেদের খাওয়াতে হবে" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত–অখণ্ড, শ্রাবণ-১৪১০ সং; পৃ-১১২০)। কিন্তু তিনি বলছেন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙতে, গায়ে হলুদ মেখে কুমিরসংকুল সংসার সমুদ্রের জলে নামতে, বনে প্রবেশের আগে পায়ে জুতো পরতে। এ সবগুলিই সংসারের ভোগকে নিষ্কণ্টক করে তোলার জন্য, মধুর করে তোলার জন্য, তাঁকে নিরস বা বিষবৎ করার জন্য নয়। কিন্তু যখন মানুষ ধনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে সে সকল ধন নিজের কুক্ষিগত করতে চায় তখনই সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিড়াল যখন সামনে তার প্রিয় খাদ্য দুধ ও মাছ দেখতে পায় তখন প্রচণ্ড লোভে পড়ে সে শুধু ক্ষুদ্র মাছ ও অল্প পরিমাণ দুধটুকুই দেখে, কিন্তু তার ঠিক পেছনেই যে একটি শক্ত মুগুর ধাওয়া করছে তা দেখতে পায় না। আমরাও সংসারে ধন ও ঐশ্বর্যের লোভে পড়ে, সেই সম্পদের চাকচিক্য দেখে তার দিকে ধেয়ে যাই কিন্তু তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রণার দিকে দৃকপাত করি না। সাপের মাথায় মণি দেখে তার ঔজ্জ্বল্যে মোহিত হয়ে সেটি ধরতে গিয়ে আমরা সর্পদংশনে প্রাণ দিই। এই দংশনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা ও শরণাগতি হচ্ছে অন্যতম অবলম্বন।

**যুগত্রাণে চৈতন্যাস্ত্র :** শ্রীরামকৃষ্ণ যুগত্রাতা। তিনি অবতার। যুগে যুগে তিনি এ পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। অবতরণ করেছেন সজ্জনদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম স্থাপন করতে। ত্রেতায় ধনুর্বাণ হাতে রাবণ বধ করেছেন, দ্বাপরে চক্রপাণি হয়ে সুদর্শনচক্র দিয়ে কংস, পুতনা, অঘাসুর, বকাসুর ইত্যাদি অসুর বধ করেছেন। যুগের বিবর্তনের ফলে যত দিন অতিক্রান্ত হয়েছে তত অসুরের সংখ্যা বেড়েছে। ভগবানের অস্ত্র ছোট হয়ে দ্বাপরে সুদর্শন চক্র রূপে তা পরিবর্তিত হয়েছিল। আর বর্তমান যুগ হল সবচেয়ে জটিল ও অতি সমস্যাদীর্ণ একটি যুগ। এখন বিশ্বের সর্বত্র কেবল অসুরদেরই আস্ফালন। এদের বর্তমান সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। এই অসুরকুলকে এখন ধনুর্বাণ বা সুদর্শনচক্র-রূপ দৃশ্যমান স্থূল অস্ত্র দিয়ে বিনাশ করা সম্ভব নয়। তাই যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণের অসুরনিধনকারী বর্তমান অস্ত্র সর্বযুগের তুলনায় সূক্ষ্মতম। তাঁর এই সূক্ষ্মতম অস্ত্রটি হলো চৈতন্যাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অতি সূক্ষ্ম, অতি শান্ত, অতি কোমল, অতি অদ্ভুত এই চৈতন্যাস্ত্র সহায়ে বর্তমান বিশ্বের অসুরকুলকে নিধন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। যে নিধনে কোনো রক্তক্ষয় নেই, যে নিধনে কোনো আওয়াজ নেই, যে নিধনে নেই কোনো আস্ফালন। বস্তুত একে চৈতন্যাস্ত্র না বলে চৈতন্যামৃত বললে অধিক উপযোগী ও যথার্থ হবে বলে মনে করি। কারণ অস্ত্র ও অমৃত— এ দুয়ের কার্যকারিতায় আছে বিস্তর পার্থক্য। অস্ত্রের মধ্যে আছে ধ্বংসের ভাব, আছে হিংসা, বিদ্বেষ, কঠোরতা। আছে রক্তপাত, আছে অশ্রু। অপরদিকে অমৃতের মধ্যে রয়েছে অমরতা, অহিংসা আর সহমর্মিতা। এতে আছে স্নিগ্ধতা, আছে শান্তি, তৃপ্তি ও কোমলতা। আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখব সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে কোনো দিন ভুল করেও কোনোরূপ মৃত্যু, ধ্বংস, হিংসা বা বিদ্বেষের অভিব্যক্তি ঘটেনি। তাঁর মধ্যে সদা সর্বদা ছিল অপার্থিব স্বর্গীয় প্রেমের প্রাণদায়ী প্রবাহ। তাঁর অসুর নিধন আসলে নিধন নয়, এটি প্রকৃতপক্ষে আসুরিক প্রবৃত্তির বিনাশ। এর মধ্যে পাপীর শাস্তির কোনো স্থান নেই, আছে পাপের শাস্তি। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি পরিবর্তন। অশুভ বুদ্ধির পরিবর্তন ঘটিয়ে শুভবুদ্ধির জাগরণ। বিচার ও বিবেকবোধ জাগ্রত করে তার মধ্যে প্রকৃত হুঁশ আনয়ন। এই পরিবর্তন দ্বারা মানুষের পশুত্ব ঘুচে গিয়ে মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটে ও পরে মনুষ্যত্ব থেকে হয় দেবত্বের উদ্বোধন। এটি একটি রূপান্তর ও এটি মানুষের প্রকৃতপক্ষে ক্রমোন্নয়ন। যেমন দুধ থেকে ঘোল, ঘোল থেকে মাখন এবং মাখন থেকে ঘি প্রস্তুত। এই উন্নয়নে আছে কেবল ক্ষমা, কেবল দয়া, কেবল প্রেম, কেবল সত্য, কেবল সরলতা, কেবল বিনয় ও কেবল সেবা। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে

সুভাষিতের সেই মঙ্গলবাণীই সত্য হয়ে উঠল—

ক্ষমায় দয়য়া প্রেম্না সুনৃতেনার্জবেন চ।
বশীকুর্যাৎ জগৎসর্বং বিনয়েন চ সেবয়া।

সুভাষিত-সম্পুট-পৃ-৫৩

এছাড়াও আছে, ক্ষমা বশীকৃতর্লোকো ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে। ক্ষান্তি খড়্গ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জনঃ।। (মহাসুভাষিতসংগ্রহ-১২১২৩)। অর্থাৎ ক্ষমার অসাধ্য কিছু নেই। ক্ষমা দিয়ে সর্বলোক বশীভূত হয়। যাঁর হাতে ক্ষমারূপ খড়গ রয়েছে দুর্জন তার কী করতে পারে? উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা জানবাজারে মথুরের কাছে যাতায়াতকারী হালদার পুরোহিতের কথা উল্লেখ করতে পারি। একদিন মথুরের বাড়ির নিকটবর্তী কোনো নিভৃতস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণকে একা পেয়ে হালদার পুরোহিত তাঁর নিকট থেকে বশীকরণমন্ত্র শিক্ষা করতে চায়। সরলমতি শ্রীরামকৃষ্ণ সবিনয়ে হালদারকে জানালেন তিনি এ সব তুক্-তাক্, বশীকরণ, মারণ, উচাটন কিছুই জানেন না। হালদারের বিশ্বাস হলো না। সে ভাবল এ বশীকরণ মন্ত্র শিখলে মথুরবাবু হালদারের অনুগত হয়ে যাবে এই ভয়ে বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে তা শিখাতে চাইছেন না। এতে হালদার ভীষণ রেগে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল অঙ্গে তার পায়ের বুটজুতা দিয়ে মাড়িয়ে আঘাত হেনে তাঁকে মূর্ছিত করে চলে গেল। ক্ষমার প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু হালদারের অত্যাচারের কথা মথুর বা তার বাড়ির অন্য কাউকেই বলেননি। পাছে হালদারের ক্ষতি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য নিয়েই আজীবন জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহাভারতের সেই অমৃতবাণী স্মরণে আসে :

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্তি অদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিত্তস্মাত্তীক্ষ্ণতরো মৃদু:।।

(মহাভারত, শতরূপে-৪২৩ পৃ)

—মৃদুতা দিয়ে দুর্দান্তকে বশ করা যায়, মৃদুতা দিয়ে নম্রকে তো বশ করা যায়ই। মৃদুতা দিয়ে বশ করা যায় না এমন কিছু নেই, সেজন্য মৃদুতাই তীক্ষ্ণতম অস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই এ যুগে কোনোরূপ কঠোর-কঠিন শাণিত বস্তু বা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে অসুর নিধন করলেন না। তাঁর অস্ত্র মৃদুতা, তাঁর অস্ত্র—চৈতন্যাস্ত্র। তাঁর অস্ত্র মানুষের চেতনাকে প্রবুদ্ধ করা ও নিখাদ শুভ চিন্তার উদ্বোধন ঘটানো।

এ বিষয়ে একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। কথাটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের মানুষকে ত্রাণ করার জন্য তাদের মধ্যে যে চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটালেন তা কিন্তু কারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে নয়। এই চৈতন্যের উদ্বোধন সম্পূর্ণ স্বতস্ফূর্তভাবে। বর্তমান যুগের মানুষের সিংহভাগই তাদের সাধারণ প্রবৃত্তি-বলে জাগতিক ভোগ-সুখকেই প্রার্থনা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন বর্তমান যুগের মানুষের অবস্থা এতটাই করুণ যে কাম-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে কী চাইতে হয়, কী প্রার্থনা করতে হয় তা-ও বুঝতে পারে না। তারা যা চায় তা ভুল করে চায়, আর যা পায় তা চায় না। তাই তিনি তাঁর প্রদত্ত মহা আশীর্বাদে উপযাচক হয়েই বলেছিলেন : ''তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব-পৃ-১১১-১৩৮৯ সং)। এটি যুগবাণী। চতুর্যুগের কোনো সময়েই কোনো অবতারে এরূপ মহাবাণী উচ্চারিত হয়নি এবং আর কখনও হবে কিনা সন্দেহ। কারণ এটি নিছক অবতারের মুখ থেকে নিঃসারিত হওয়া সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন অবতার বরিষ্ঠের। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠ, আর এ জন্য এই মহাবাণী কেবল শ্রীরামকৃষ্ণেরই পেটেন্ট। এটি হলো অহৈতুকী কৃপা। আর এটিই হলো উত্তম দান। এই সম্বন্ধে একটি সুভাষিতে বলা হয়েছে :

উত্তমোহপ্রার্থিতো দত্তে মধ্যম: প্রার্থিত: পুন:।
যাচকৈর্যাচ্যমানোহপি দত্তে ন ত্বধমাধমঃ।।

মহাসুভাষিতসংগ্রহ-৬৫০৫

অর্থাৎ প্রার্থনা শোনার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে দান করা হয় তা হলো উত্তম দান, আর প্রার্থিত হয়ে যে দান করা হয় তা মধ্যম দান। অপরদিকে প্রার্থী প্রার্থনা করার পরও যে ব্যক্তি দান করে না সে অধম বলে পরিগণিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ উপযাজক হয়ে মানুষকে চৈতন্য দান করেছেন তাই তিনি উত্তম দাতা। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল দুদিনের ব্যবহারযোগী সাধারণ বস্তু দান করে তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি। তিনি চিরদিনের মতো সকল অভাব ঘুচিয়ে দিতে এক পরমবস্তু দান করেছেন। যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়, অন্য কিছু পাবার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন কোনোটিই থাকে না। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দানযজ্ঞে যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকির হতেও কুণ্ঠিত হননি। এ যেন প্রদীপের সলতা। নিজে তিল তিল করে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েও জগতকে আলোকিত করা। তবে আমাদের সান্ত্বনা এই—শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ। আর পূর্ণ থেকে পূর্ণকে গ্রহণ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। একটি চুম্বকখণ্ডকে বহুধা বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখলেও প্রতিটি খণ্ডে চুম্বকের সম্পূর্ণ সত্তাই বর্তমান থাকে। একটুও কম পড়ে না। সেজন্য বলতে চাই শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠ, তিনি কলা নন, তিনি অংশ নন, তিনি পূর্ণ। তাঁর পূর্ণতা থেকে নিঃশেষে সব কিছু দান করার পর আবার তিনি পূর্ণই থেকে যান। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর প্রশস্তি মন্ত্রে আছেঃ

অপূর্ব কোহপি ভাণ্ডারস্তব ভারতি দৃশ্যতে।
ব্যয়তো বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়মায়াতি সঞ্চয়াৎ।।

অর্থাৎ হে দেবী সরস্বতি। অপূর্ব তোমার ভাণ্ডার। যে ভাণ্ডার থেকে সম্পদ দান করলে তা আরও বেড়ে যায়। দান করলে কমে যায় না। যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণের ত্রাণভাণ্ডও সেরূপ অফুরান। তিনি এই অপূর্ব ভাণ্ড থেকে যত দান করেন তাঁর ভাণ্ড তত বেশি সমৃদ্ধ হয়। যুগত্রাণে তিনি তাঁর এই অফুরান ত্রাণভাণ্ড হতে অকাতরে পরম সম্পদ বিতরণ করেছেন। আজও করছেন। নিরন্তর

*With Best Compliments from :*

# Durga Trading Co.

40, Strand Road, Fourth Floor (Room No.4)

Kolkata - 700 001

Phone : 2243-1722

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

***Deals In:***

*Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips & Other Raw Materials for paper mills*

**An ISO 9001 : 2008 Certified Company**

*Alloy Group*

**UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.**

**AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.**

**RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.**

**Aluminium & Hardware People**

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED

AN ISO 9002 COMPANY JINDAL ALUMINIUM LIMITED

NALCO Aluminium Sheet Coil

Aluminiuam Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

**Phone : 4050 3400**

**E-mail :** info@alloyindia.com **Website :** www.alloyindia.com

নিরবচ্ছিন্নভাবে। যাঁরা বোদ্ধা তারা বোঝে, যাঁরা দ্রষ্টা তারা দেখে, যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা উপলব্ধি করে।

**যুগত্রাণে সঙ্ঘ গঠন বা বৈকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা :** হিন্দু দর্শনে যুগচক্র তথা কালচক্রকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই চারটি যুগ হলো—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ। চারটি যুগের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শাস্ত্রে চার যুগের চার প্রকারের শক্তির উল্লেখ দেখা যায়।

ত্রেতায়াং মন্ত্রশক্তিশ্চ জ্ঞানশক্তি কৃতেযুগে।
দ্বাপরে যুদ্ধশক্তিশ্চ সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।।

বেদব্যাস, সুভাষিত-৮২

অর্থাৎ ত্রেতাযুগে মন্ত্রশক্তি, সত্যযুগে জ্ঞানশক্তি, দ্বাপরে যুদ্ধশক্তি ও কলিযুগে সঙ্ঘশক্তি কার্যকর হয়। আমরা সাধারণ মানুষ বর্তমান যুগকে কলিযুগ বলেই চিহ্নিত করি। আমাদের বর্তমান আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা কলিযুগের ত্রাতা হিসাবেই উপস্থাপন করতে চাই। ব্যাসদেব কলিযুগের শক্তির উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে সঙ্ঘশক্তিকেই উল্লেখ করেছেন। যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণকেও দেখি এ যুগ অর্থাৎ কলিযুগের ত্রাণের জন্য ব্যাসকথিত এই সঙ্ঘশক্তিকেই কার্যকর করেছেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তা প্রকৃত অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেছেন। যুগত্রাণের যন্ত্র হিসাবে এই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা বর্তমান বিশ্বের এক পরম অবলম্বন। এ যেন স্বর্গরাজ্যের রাজধানী বৈকুণ্ঠ। সাধারণ তাপিত মানুষের শান্তির নিলয়, পরম আশ্রয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গঠনের মূল সূত্রটি এখানে ধরিয়ে দিতে চাই। এ জন্য আমরা স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির সাহায্য নিচ্ছি। আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মর্ত্যলীলা অবসানের পূর্বে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে চিকিৎসার্থ অবস্থান করছিলেন। তিনি আসলে এ সময়ে সকলের অগোচরে পরোক্ষভাবে তাঁর ত্যাগী ও গৃহী সন্তানগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘকেই গড়ে তুলছিলেন। এ সময়ে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরমপ্রিয় ও প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়ে তার ব্যক্তিগত সাধন জীবন ও ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী স্থির করে দিচ্ছিলেন। এরূপ এক নিভৃত উপদেশকালে তিনি বলেছিলেন : ''দেখ নরেন, তোর হাতে সকলকে দিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন ভজনে মনে দেয়, তার ব্যবস্থা করবি'' (যুগনায়ক বিবেকানন্দ-১ম খণ্ড -পৃ-১৩৮)। গুরুর নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ আজীবন এই দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভবিষ্যতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে কলকাতার বলরামমন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হয়। যার উদ্দেশ্য এককথায় আত্মমোক্ষ ও জগতের হিত। বস্তুত, এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েরই ত্রাণ করলেন। আর এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির সঙ্গে ত্রাণ করলেন ভারতকে ও বিশ্বমানবকে।

**যুগত্রাণে প্রার্থনা শিক্ষা :** বর্তমান যুগে কলির প্রকোপে আমরা বুঝতেই পারি না কোনটি আমাদের পক্ষে হিতকর আর কোনটি ক্ষতিকর। শুধু তাই নয় আমাদের অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে হিতকর বস্তুটিকে অহিতকর এবং অহিতকর বস্তুটিকে হিতকর বলে মনে করি। যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এই বিভ্রান্তি দূর করতে বদ্ধপরিকর হলেন। পাছে অকল্যাণকর ভুল বস্তু প্রার্থনা করে তা লাভ করার ফলে আমরা বিপন্ন হই, সেজন্য তিনি আবারও উপযাজক হয়ে শিক্ষা দিলেন এ সংসারে একটু শান্তিতে থাকার জন্য আমাদের কী প্রার্থনা করতে হবে। তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে বলছেন : আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম : বলেছিলাম, মা, আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, ও মা। শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাভক্তি হয় মা। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত–অখণ্ড, শ্রাবণ-১৪১০ সং, অখণ্ড-৬৪৬ পৃ) । অপর এক সময়ে তাঁর আর্তি: ''মা আমি তোমার শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা। লোকমান্য চাই না, (অণিমাদি) অষ্টসিদ্ধি চাই না, কেবল এই করো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা, অহৈতুক ভক্তি হয়। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, তোমার মায়ার সংসারে, কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনো না হয়। মা। তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন---কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত–অখণ্ড, শ্রাবণ-১৪১০ সং, অখণ্ড-৭৭৫ পৃ) যুগত্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে এই অনবদ্য প্রার্থনা শিক্ষা দিয়ে বর্তমান যুগের দিশেহারা মানুষকে ত্রাণ করতে চেয়েছেন।

এই প্রার্থনাতেই তিনি বর্তমান যুগের দুই মহারিপুর উল্লেখ করে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছেন। এ পরিত্রাণ প্রার্থনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের জন্য নয়, এ প্রার্থনা আমাদের সকলের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ–ভাবনার অনুসারী ইদানীংকালের একটি ইংরাজি বাক্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাক্যটি হলো—Seek worship, Wisdom and work–not wealth, women and wine. (wisdom, May, 2005, p-29) এই প্রার্থনা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষেই সমান উপযোগী। কিন্তু সবশেষে রামকৃষ্ণগতপ্রাণা ও তদ্ভাবরঞ্জিতাকারা সারদাদেবীর প্রার্থনা-বিষয়ক উপদেশ স্মরণ করে আমার লেখা শেষ করব। মা বলেছেন—''নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।'' তাই ''হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে আজ আমরাও বলতে চাই : তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।'' □

*With Best Compliments From -*

# South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

***Sales & Service***

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

***Authorised Dealers of***

- **BOSCH LTD.**
- **BOSCH, GMBH-GERMANY,**
- **DEUTZ, A. G., GERMANY**
- **LOMBARDINI - ITALY,**
- **V. M. MOTORI - ITALY**

*With Best Compliments From :*

# <u>Dr. Sawar Dhanania</u>

***Master in Mech. Engineering (Gold Medalist) Jadavpur University, Kolkata***

***PhD IIT, Kharagpur, W. B.***

***Chairman***

***Rubber Board, Ministry of Commerce & Industry***

***Govt. of India***

**Email : sdhanania@gmail.com**

**Mob. : 9331741971**

# ছোট্ট জিজ্ঞাসা

শুভেন্দু ভট্টাচার্য

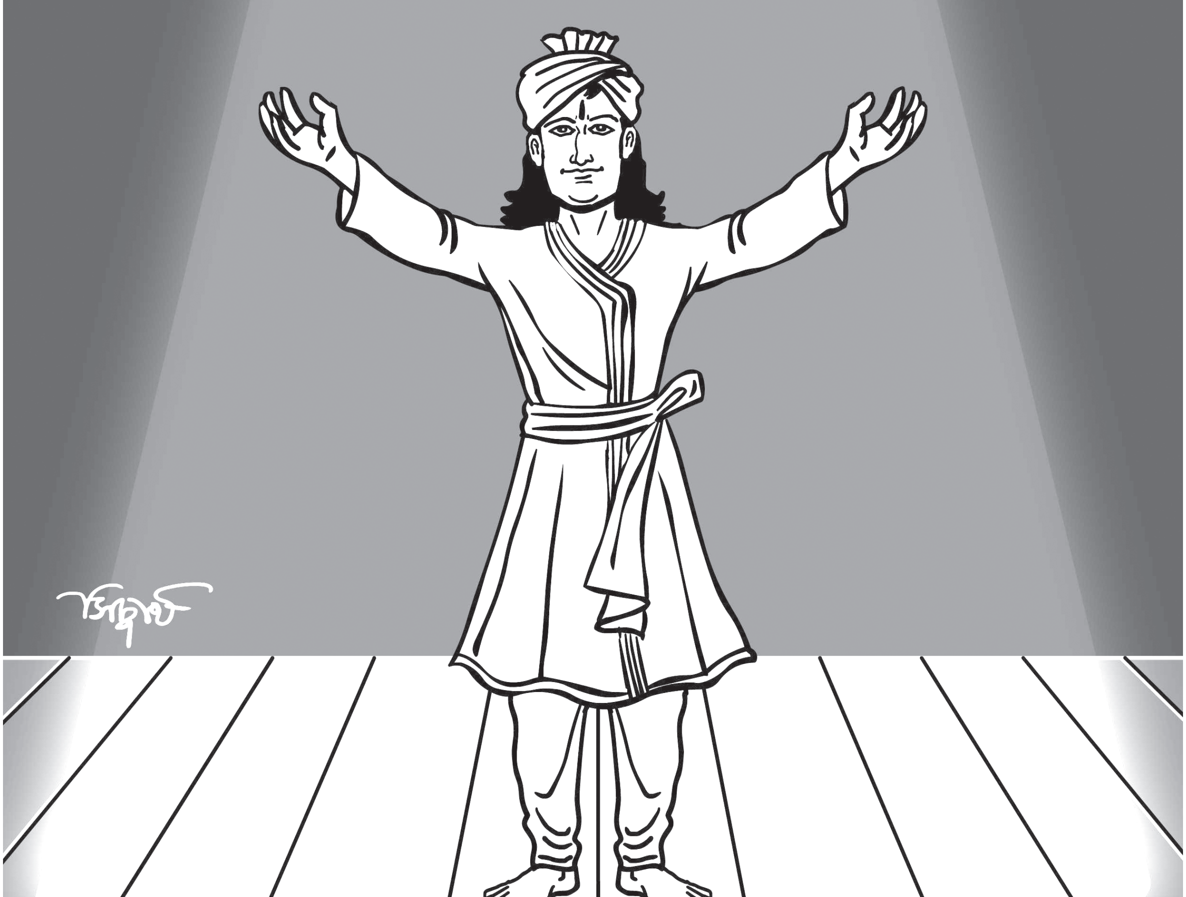

**নাট্যবস্তু**

বর্তমান সমাজে নিজেকে হিন্দু বলে গর্বিত হওয়া মানুষের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। তবে একেবারেই যে সেই রকম মানুষ নেই তা বোধহয় বলা যাবে না। কয়েক দশক ধরেই আমাদের বঙ্গসমাজে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যে বাঙ্গালি একদা শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্মীয় চেতনায় দেশের অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। যে বঙ্গ একদা মহাপুরুষদের মিলনক্ষেত্র ছিল, সেই বঙ্গেই আজ চরম দৈন্য। একদল মেকি মুখোশধারী হিন্দু পদবিধারী মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতাবান হয়ে উঠে হিন্দু ধর্মেরই ক্ষতিসাধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাদের দেখতে মানুষের মতো হলেও সঠিক শিক্ষা ও সঠিক মূল্যবোধ এবং সঠিক সংস্কারের অভাবে এরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। এদের একটাই উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের ক্ষতিসাধন করা। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যারা হিন্দু আদর্শ, হিন্দু ভাবধারা, হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে সদা কাজ করে চলেছে, নাটকে শুভঙ্কর রায় সেই রকমই একজন ব্যতিক্রমী চরিত্র। যে সমাজের বিভিন্ন বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে চলেছে। আর আছে বিবেক যে মানুষকে ভাবাচ্ছে। কখন যে কার ভিতর জাগ্রত হবে কে জানে? তবে যে মানুষের বিবেক জাগ্রত হচ্ছে সে হয়তো নিজের ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আর যাদের বিবেক এখন জাগ্রত হয়নি তাদের জন্য রইল ছোট্ট একটা প্রশ্ন।

**চরিত্রলিপি**

| **পুরুষ** | **স্ত্রী** |
|---|---|
| বিবেক | |
| শুভঙ্কর রায় | সুতপা |
| অসিত মাল | সোনালী |
| অরুণ | শ্রাবণী |
| সৌম্য | |
| ভাস্কর | |
| পচা | |
| গদাই | |
| রঘু | |
| সৌমেন দাস (ছকু) | |

একদা যে জাতি ধর্মরক্ষার্থে ব্রতী হয়েছিল, আজ সেই জাতিই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের পূর্বপুরুষদের গর্বিত ইতিহাস মুছে ফেলে নিজেদের তুষ্টিকরণ আর তোষণের দাস বানিয়ে ফেলেছে। দেশবিভাজনের পর যাদের পূর্বপুরুষদের শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সবকিছু হারিয়ে একবস্ত্রে পালিয়ে আসতে হয়েছিল এই দেশে, আজ তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হিন্দুদের প্রধান শত্রু হয়ে উঠে এক ভয়ংকর ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। এর পরিণতি যে কী ভয়ংকর হতে চলেছে তার আভাস আমরা পাচ্ছি।

শুভঙ্কর রায় পেশায় একজন আইনজীবী। স্ত্রী সুতপা এবং পুত্র সৌম্যকে নিয়ে তার বেশ সুখের সংসার। শুভঙ্কর মনেপ্রাণে একজন হিন্দুত্ব আদর্শিত মানুষ। সমাজের বুকে তথাকথিত রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতা ভাস্কর যখন তাকে রামনবমীর পূজা বন্ধ করতে বলে তখন সে ভয়ে পিছয়ে যায় না।

অসিত মাল যখন শেখ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, তখন শুভঙ্কর তার পাশে দাঁড়িয়ে একত্রে লড়াইয়ের বার্তা দেয়।

আবার যখন আদর্শগত বিরোধী ছকু নিজের ভুল সংশোধন করে নিজের মেয়ের জীবন বাঁচাতে স্ত্রী শ্রাবণীকে নিয়ে ছুটে আসে তার কাছে। তখনও শুভঙ্কর তাদের ফেরাতে পারে না।

**প্রথম অঙ্ক**

**প্রথম দৃশ্য**

[হালকা আবহ সংগীত বাজছে। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে একটি হালকা আলোর বৃত্ত ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হচ্ছে তার মধ্যে দেখা যায় এক সুদর্শন পুরুষকে।]

বিবেক— নমস্কার, আজ আমি আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি। আপনারা আমায় চেনেন না। কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। বেশি সময় নেবো না। আসলে বেশি সময় আমার হাতেও নেই, তবু আজ আমায় আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হলো। কী ভাবছেন, আবোলতাবোল কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর আমার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তবু আসতে হলো। আর কতদিন চুপ করে শুয়ে থাকবেন? কবে ঘুম ভাঙ্গবে আপনাদের? অবাক হচ্ছেন এ আবার কী প্রশ্ন? অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু জানেন আমিও অবাক হচ্ছি আপনাদের দেখে। আর কতদিন সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে মুখোশ পরে থাকবেন? পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন? এই আপনাদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনি, যাদের একসময় একটি দেশ ছিল, নিজের বাড়ি ছিল, ক্ষেতভরা ফসল ছিল, পুকুরভরা মাছ ছিল। মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা? কিন্তু একদিন সব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। তখন নয় এই দেশটি ছিল যেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু এর পরে যে আর পালাতে পারবেন না। আর তো পালাবার জায়গা নেই। কী করবেন? ভাবতে হবে আপনাদের। কারণ আপনার ভাবনার দায়িত্ব আমার নয়। আমার দায়িত্ব আপনাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানো। আর বেশি সময় নেই এবার আমায় যেতে হবে। যাবার আগে আর একটি কথা বলে যাই, আমি আপনাদের সঙ্গে সব সময় থাকবো, কিন্তু যদি এখনই না জাগেন তাহলে হয়তো কয়েক বছর

পরে এমন দিন আসবে যখন আপনাদের বাপ-ঠাকুরদার দেওয়া নাম থাকবে না, ঘর থাকবে না, দেশ থাকবে না। তখন আপনারা কী করবেন? কোথায় যাবেন? ভাবনাটা আপনাদের। ভাবানোর দায়িত্বটা আমার কারণ আমি আপনাদের বিবেক।
[ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে যায়।]

**প্রথম অঙ্ক**

**দ্বিতীয় দৃশ্য**

[মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যায় শুভঙ্করদের ঘর। শুভঙ্কর চেয়ারে বসে মনযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে সুতপা। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর চায়ের কাপ রাখে।

সুতপা— সকাল থেকে এই নিয়ে দু'বার চা হয়ে গেল।

শুভঙ্কর— (কাগজ থেকে চোখ না তুলেই) হু।

সুতপা—আর কিন্তু চা চাইবে না। ছুটির দিন থাকলেই তোমার চা খাওয়া বেড়ে যায়। বলছি একবার বাজারে যাবে কয়েকটি জিনিস আনার ছিল।

শুভঙ্কর— (মুখ তুলে) আবার কী জিনিস? গতকাল রাতে চেম্বার থেকে ফেরার সময় তো তোমার ফর্দ মতো দোকান বাজার করে নিয়ে এলাম।

সুতপা—হুম, আসলে কয়েকটি ছোটখাটো জিনিস লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

শুভঙ্কর—তা এখন কী আনতে হবে?

সুতপা—বেশি কিছু নয়, একটু কালোজিরে, গোলমরিচের গুড়ো, গোটাজিরে আর তেজপাতা।

শুভঙ্কর—ঠিক আছে একটু পরে গিয়ে নিয়ে আসছি।

সুতপা—তুমি নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণে জলখাবার তৈরি করি।

[ সুতপা মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। শুভঙ্কর চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে খবরের কাগজ পড়তে থাকে। এমন সময় কলিংবেল বেজে ওঠে, শুভঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খোলে, এক অপরিচিত ব্যক্তি মঞ্চে প্রবেশ করে।]

ব্যক্তি—আপনি কি অ্যাডভোকেট শুভঙ্কর রায়?

শুভঙ্কর—হুম। কিন্তু আপনি?

ব্যক্তি—আমি অসিত মাল। বড় বিপদে পরে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

শুভঙ্কর—বুঝলাম। কিন্তু অসিতবাবু আমি বাড়িতে ক্লায়েন্ট ভিজিট করি না। বিকেলে আমার চেম্বারে আসুন।

অসিত—স্যার, আমি অনেক কষ্ট করে আপনার ঠিকানা জোগাড় করে সেই হাসনাবাদ থেকে আপনার বাড়িতে আসছি। আমি বড়ই বিপদে আছি। তাই যদি একটু....

[শুভঙ্কর ও অসিত চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়। শুভঙ্কর চেয়ারে বসে হাতের ইশরায় অসিতকে বসতে বলে।]।

শুভঙ্কর—আপনি বেশ হাঁপাচ্ছেন, একটু জল খাবেন?

অসিত—একটু পেলে ভালো হতো।

শুভঙ্কর—(উচ্চঃস্বরে) সুতপা এক গ্লাস জল দাও তো।

[ ভিতর থেকে সুতপার কণ্ঠস্বর পাওয়া যায়– দিচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুতপা জলের গ্লাস হাতে মঞ্চে প্রবেশ করে টেবিলের উপর জলের গ্লাস রাখে।]

শুভঙ্কর—নিন জলটা খেয়ে নিন।

[অসিত খুব দ্রুত গতিতে ঢকঢক করে গ্লাসের জল পান করে।]

অসিত—বড় তৃপ্তি পেলাম।

শুভঙ্কর—হ্যাঁ এবার বলুন।

অসিত—আমার বাড়ি হাসনাবাদ থেকে আরো ষোলো কিলোমিটার দূরে। মানে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম হিঙ্গলগঞ্জে। ওখানে আমার পৈতৃক বাড়ি। বেশকিছু জমি জায়গাও আছে আমাদের। একশো বিঘার মতো চাষের জমি, সঙ্গে গোটা তিনেক বড় পুকুর। আগে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তারমধ্যে কিছু পূর্বে বাবা বিক্রি করে দেন, আর বেশিরভাগটা দখল হয়ে যায়। আমরা চার ভাই, তিন বোন। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমি সবার ছোটো। আমার তিন দাদাই চাকরি সূত্রে বাইরে থাকেন। আমার আগের দুই দাদার মধ্যে একজন থাকেন আমেদাবাদ আর একজন থাকেন নাগপুর। আর আমার বড় দাদা থাকতেন বর্ধমানে, ওখানেই নিজে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। তিন বছর হলো দাদা প্রয়াত হয়েছেন। দাদা সরকারি ব্যাংকে চাকুরি করতেন। বড় বৌঠান এবং আমার এক ভাইপো ও এক ভাইঝি ওরা কেউই বড় একটা গ্রামের বাড়িতে আসে না। ঠাকুরদার আমল থেকে আমাদের বাড়িতে বাসন্তীপূজা হয়ে আসছে, আর সেই ট্রাডিশন আমি এখনো ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছি। আর সেই পূজার সময়েই আমরা সমগ্র পরিবার একত্রিত হই। জমি জায়গা হিসেবনিকেশ সবই আমি একা দেখি। আমার নিজের একটা ওষুধের দোকান আছে। আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এই হলো আমার পরিবার।

শুভঙ্কর—সেতো বুঝলাম। কিন্তু আপনার সমস্যাটা ঠিক কী বুঝতে পারলাম না।

অসিত—না সমস্যাতো এখনো আপনাকে বলা হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের জমি-বাড়ির উপর শাসকগোষ্ঠীর ছোট-বড়- মাঝারি নেতাদের নজর ছিল। আগের সরকারের সময়ও ছিল আর এই সরকারের সময় তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। শেখ জাহাঙ্গীর হলো এখন আমাদের ওখানকার ডন। ওর কথাতেই সবাইকে চলতে হয়। আর ওর মাথার উপর শাসক দলের হাত আছে। এই শেখ জাহাঙ্গীর বছর কুড়ি আগে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে আমাদের গ্রামে এসে ওঠে। তৎকালীন সরকারের যে কেষ্ট-বিষ্টু ছিল তাদের সহযোগিতায় ভারতের নাগরিকত্বের

পরিচয় পত্র তৈরি করে এই দেশে বসবাস শুরু করে, শুধু তাই নয় পরবর্তী সময় বাংলাদেশ থেকে নিজের বাবা-মা, ভাই সবাইকে এই দেশে নিয়ে আসে এবং রাতারাতি তাদেরও এই দেশের নাগরিক বানিয়ে ফেলে। একদা গ্রামের রাস্তায় ভ্যান চালানো জাহাঙ্গীর ধীরেধীরে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক নেতা। তারপর সরকার বদল হলে জাহাঙ্গীরও জামা বদল করে হয়ে ওঠে হিঙ্গলগঞ্জের ডন। তার পর বেছে বেছে হিন্দুদের জমি কবজা করতে শুরু করে। চাষের জমি দখল করে। মাছের ভেড়ি তৈরি করা শুরু করে, ফসলি জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে ফসল নষ্ট করে জমি দখল করা শুরু করে। আর এর বিরুদ্ধে কেউ কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না। করলেই তার কপালে জুটবে মার, তার বাড়ির মেয়ে বউদের রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করবে। ভয়ে সবার মুখ বন্ধ। কোনো সুন্দরী মেয়ে যদি একবার ওর চোখে পড়ে তাহলে সেই রাতে সেই মেয়েটিকেও তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপর যৌন অত্যাচার চালাবেই। তাই গ্রামের অধিকাংশ যুবতী গ্রামের বাইরে অন্যকোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি রেখে আসা হয়।

শুভঙ্কর—আপনারা পুলিশে কমপ্লেন করেননি?

অসিত—কী লাভ কমপ্লেন করে। পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ বলে দাদার কথা শুনে চলুন, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে যাবেন না। আর যেই-ই যখন পুলিশের কাছে গেছে, সেই খবর সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কাছে পৌঁছে যায়। আর তার পরদিনই গ্রামবাসিদের একত্রিত করে সবার সামনে জাহাঙ্গীর সেই ব্যক্তির বিচার করে। আর সেই বিচার ভয়ংকর। এবার জাহাঙ্গীরের নজর পড়েছে আমার জমির উপর। কিন্তু আমি কিছুতেই আমার পূর্বপুরুষের জমি ওকে দেব না। আমার পরিবার, দাদা, বউদিরা সবাই ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি না। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমি জানি আপনি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। বিচার ব্যবস্থার উপর আমার বিশ্বাস আছে।

শুভঙ্কর—কিন্তু, প্রথমে আপনাকে তো লোকাল থানায় ওর নামে একটা এফআইআর করতে হবে। এবং তারপরে কোর্টে কেসটা ফাইল করতে হবে।

অসিত—কিন্তু স্যার, লোকাল থানা শেখ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর জমাই নেবে না।

শুভঙ্কর—নিতে তো ওদের হবেই। দরকার হলে জিরো এফ আইআর করে তারপর ফাইল করবো।

অসিত—আপনি যেটা ভাল বুঝবেন সেটাই করবেন। টাকা পয়সা যা লাগে আমি দেব। কিন্তু কিছুতেই আমার পিতৃপুরুষের ভূমিকে ওই লুটেরাদের হাতে তুলে দেব না।

শুভঙ্কর—কেন দেবেন? একি মামদোবাজি নাকি। আপনি একদম ঠিক কাজ করেছেন। আপনি সামনের সপ্তাহে আসুন প্রথমে আমি এফআইআরের কপিটা তৈরি করে এফআইআরটা করি তারপর কোর্টে কেসটা ফাইলিং করবো। আর আপনাদের গ্রামেও আমি একদিন যাব।

অসিত—অবশ্যই স্যার, শুধু যাওয়ার আগে আমাকে একটু ফোনে জানিয়ে দেবেন। তাহলে আজ আমি আসি নমস্কার। [শুভঙ্কর ও সুতপা দুজনের দিকে হাতজোড় করে নমস্কার করে অসিত মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়।]

সুতপা—একি ভয়ংকর কাণ্ড। এ কোথায় বাস করছি আমরা, এটা কি পশ্চিমবঙ্গ না বাংলাদেশ? আমার কেমন মাথা ঘুরছে। তুমি সারাদিন এইসব শুনেও যে কী করে ঠিক থাক কে জানে? আমি বাবা রান্নাঘরে যাই। তুমি বসো তোমার জলখাবার নিয়ে আসি।

[সুতপা দ্রুতপায়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়, শুভঙ্কর চেয়ারে বসে মোবাইল ফোন দেখতে থাকে, একটু পরেই সুতপা জল খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে সামনের টেবিলের উপর প্লেটটা রাখে।]

শুভঙ্কর—তুমি খাবে না?

সুতপা—আমি পরে খাব। তুমি খেয়ে নিয়ে দোকানের জিনিসগুলো আগে এনে দাও। আমি যাই গিয়ে দুপুরের রান্না চাপাই।

শুভঙ্কর—(খাবার মুখে দিয়ে) একদম।

সুতপা—আজকে আবার ঊষা কাজে আসনি। রান্না করা, বাসন মাজা সব একা হাতেই করতে হচ্ছে।

শুভঙ্কর—(খেতে খেতে) সে কী?

সুতপা—তাহলে আর বলছি কী?

শুভঙ্কর—তোমার নবাবপুত্তুরের খবর কী? সকাল থেকে তাকে তো দেখছি না। এই ছোটখাটো দোকানের জিনিসগুলো তো সেই আনতে পারে।

সুতপা— সে কি বাড়িতে আছে? কোন ভোরবেলা বেরিয়েছে।

শুভঙ্কর—(খাওয়া শেষ করে) তা কোথায় গেছে?

সুতপা—বাবুর বন্ধু আছে না? কী যেন নাম অরিত্র, ওর মা তো হাসপাতালে ভর্তি। সেখানেই গেছে।

শুভঙ্কর—কেন কী হয়েছে ওর মায়ের।

সুতপা—গতপরশু রান্না করার সময় হঠাৎ আগুন লেগে যায় শাড়িতে।

শুভঙ্কর—সর্বনাশ। তা এখন কেমন আছেন উনি? কোথায় ভর্তি করেছে?

সুতপা—বাবুতো বললো ভালো নয়। বার্ন বেশি হয়নি থার্টি পার্সেন্ট। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বাঙ্গুর হাসপাতলে ভর্তি করেছে। আইসিইউ-তে রয়েছে।

শুভঙ্কর—তা হলে তো আমাদের একবার গিয়ে দেখে আসতে হয়। এই

সময় ওই ছেলেটির পাশে থাকা খুব প্রয়োজন। বাবু ঠিক কাজই করেছে। যাই হোক তুমি দরজা বন্ধ করো, আমি দোকান থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসি চট করে।

[শুভঙ্কর মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়, সুতপা দরজা বন্ধ করার ভঙ্গি করে মঞ্চের অন্য প্রান্ত থেকে ভিতরে চলে যায়। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে যায়।]

**প্রথম অঙ্ক**

**তৃতীয় দৃশ্য**

[মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যায় রাস্তার পাশে রঘুর চায়ের দোকান। দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে এলাকার পৌরপ্রতিনিধি ভাস্কর দাস ও তার দুই সহচর গদাই আর পচা। শুভঙ্কর মঞ্চে প্রবেশ করে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে।]

ভাস্কর—ও শুভঙ্করদা, চললেন কোথায়?

শুভঙ্কর—একটু দোকানে যাব। কয়েকটি জিনিস কেনার আছে।

ভাস্কর—তা একটু চা খেয়ে যান।

শুভঙ্কর—না দাদা, এখন চা খাব না।

ভাস্কর—খাবেন না। ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমার দরকারি কিছু কথা আছে।

শুভঙ্কর—দরকারি কথা আমার সঙ্গে? বলুন

ভাস্কর—শুনলাম নাকি আপনি এবার রামনবমীতে রামের পূজা করছেন?

শুভঙ্কর—হ্যাঁ করছি। কেন আপনার অসুবিধা আছে?

ভাস্কর—তা তো একটু আছেই। ওসব রাম-টামের পূজা এখানে করা যাবে না বুঝেছেন?

শুভঙ্কর—কেন? কেন করা যাবে না।

পচা—ও দাদা যখন বলে দিয়েছে তখন করা যাবে না।

ভাস্কর—এই তুই চুপ কর। ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানিস না।

গদাই—দাদা যখন বলছে তখন কথা বলিস না।

ভাস্কর—দেখুন, ওসব রামের পূজা

আমার এলাকায় চলবে না।

শুভঙ্কর—সেটাই তো জানতে চাইছি কেন করা যাবে না?

ভাস্কর—রামতো বহিরাগত। তার পূজা কেন করবেন?

শুভঙ্কর—রাম বহিরাগত? এটা আপনাকে কে বলছে?

ভাস্কর—আমাদের হাইকমান্ড বলেছে। আর হাইকমান্ড যা বলবে সেটাই ঠিক। পূজা তো আমরাও করি দুর্গাপূজা। কলকাতার সেরা পূজা আমরাই করি। তিনকোটি টাকা বাজেট। এবছর বাজেট হয়তো আর একটু বাড়বে। গতবছর মহালয়ার দিন উদ্বোধন করিয়েছিলাম সিএম-কে দিয়ে, এবার ইচ্ছে আছে মহালয়ার আগের দিন করাব।

শুভঙ্কর—হুম। বুঝলাম।

ভাস্কর—বুঝে গেছেন তো। তাহলে কিন্তু রামপূজা বন্ধ।

শুভঙ্কর—দুঃখিত। আপনার কথা রাখতে পারছি না।

ভাস্কর—মানে?

শুভঙ্কর—মানে আর কী? রামনবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা হচ্ছে। আপনাদেরও নিমন্ত্রণ রইল।

ভাস্কর—দেখুন শুভঙ্কর দা, আপনারা এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। আপনি পেশায় একজন উকিল, তাই আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলছি। এমনিতে আপনার নামে আমার কাছে অনেক রিপোর্ট আছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে অনেক কিছু লেখেন। হিন্দুত্ব নিয়ে অনেক বড় বড় লেকচার দেন। অনেক সাম্প্রদায়িক পোস্ট করেন। কিন্তু সেই ব্যাপারে আমি কি আপনাকে কোনদিন ডেকে কিছু বলেছি? বলিনি তো?

শুভঙ্কর—তার মানে? আপনি বলবার কে? আর আপনি বললেই আমাকে সেটা শুনতে হবে এমনটাতো নয়। আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার কি কথা বলার কোনো অধিকার আছে? আপনি বোধহয় আইন সম্বন্ধে খুব একটা অবগত নন।

ভাস্কর—দেখুন আমার ভদ্রতাকে আমার দুর্বলতা ভাববেন না। বেশি আইনটাইন দেখাবেন না। মনে রাখবেন প্রশাসনটা কিন্তু আমাদের হাতে।

শুভঙ্কর—সে তো বটেই।

ভাস্কর—তা হলে সবইতো জানেন। আমি যেটা বলালাম সেটা কিন্তু মাথায় রাখবেন।

শুভঙ্কর—অবশ্যই। ও ভালো কথা, সামনেই রামনবমী শ্রীরামচন্দ্রের পূজা সেইদিন কিন্তু অবশ্যই আমাদের পূজায় আসবেন। একেবারে সপরিবারে।

ভাস্কর—আপনি তো বহুত ফালতু লোক। আপনাকে এত ভালো কথায় বোঝালাম, তারপরেও মটকা গরম করে দিচ্ছেন। এর পরে যদি কিছু ঘটে তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না।

শুভঙ্কর—ভয় দেখাচ্ছেন? তা আপনি দেখাতেই পারেন। তবে কী জানেন ,যখন একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি রামনবমীতে পূজা করবো তখন করবোই। আপনি আটকাবার চেষ্টা করতেই পারেন। সেক্ষেত্রে আমাকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে এই আর কী। আচ্ছা আসি তাহলে।

[শুভঙ্কর মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়।]

গদাই—দাদা, মালটাকে শাল্টে দেব?

পচা—হ্যাঁ দাদা, গদাই ঠিকই বলেছে। আপনি শুধু একবার বলুন মালটাকে বাড়ি থেকে তুলে এনে কেলিয়ে দিচ্ছি।

ভাস্কর—ইচ্ছেতো আমারও তাই করছে। কিন্তু এখন এসব রিস্ক নেওয়া যাবে না। সামনে ইলেকশন আছে। আর তাছাড়া মালটা উকিল, না জানি কখন কী কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। তখন আর এক ঝামেলা। তোরা বরঞ্চ একটা কাজ কর মালটার উপর নজর রাখ।

পচা—ঠিক আছে।

[সমস্ত চরিত্র স্থির হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো নিভে যায়।]

**প্রথম অঙ্ক**

**চতুর্থ দৃশ্য**

[অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হলে দেখা যায়, শুভঙ্করদের ঘর। সুতপা ঝাড়ু দিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে আর গুনগুন করে রবি ঠাকুরের গান করছে 'সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে।' হঠাৎ দরজায় কলিং বেলের শব্দ।]

সুতপা—ওই বোধহয় ও এলো।

[ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। সৌম্য মঞ্চে প্রবেশ করে।]

সুতপা—কীরে অরিত্রর মা এখন কেমন আছেন?

সৌম্য—ভালো নয়। বলছি, বাবা কোথায়?

সুতপা—তোর বাবা একটু দোকানে গেছে। বলছি, সকাল থেকে কিছু খেয়েছিস।

সৌম্য—তেমন কিছু নয়। শুধু চা-বিস্কুট।

সুতপা—বোঝ ছেলের কাণ্ড। কোন কাকভোরে বেরিয়েছিস কিছু না খেয়ে। আর তারপর শুধু চা বিস্কুট?

সৌম্য—কী করবো? অরিত্র খুব ভেঙে পড়েছে। ও তো কিছুই খেতে চাইছে না। এবার ও খাচ্ছে না আমি একা কী করে খাই বলতো?

সুতপা—বুঝেছি। ঠিক আছে তুই জামা প্যান্ট চেঞ্জ করে হাতমুখ ধুয়ে আয় আমি জলখাবার দিচ্ছি।

সৌম্য—ঠিক আছে।

[সৌম্য ঘরের ভিতর চলে যায়।]

সুতপা—যাই দেখি, ছেলেটার জন্য জলখাবার তৈরি করে দিই। আর ওদিকে লোকটা কখন দোকানে গেছে এখনো ফেরার নাম নেই। নিশ্চয়ই কারও সঙ্গে গল্প করছে চায়ের দোকানে বসে। বাইরে এই তেতোপোড়া রোদ্দুর, ছাতাটাও সঙ্গে

নিয়ে যায়নি। এই বাপ আর ছেলে কিছুতেই ছাতা নিতে চায় না।

[দরজায় বেলের শব্দ বেজে ওঠে]

সুতপা—ওই এলো বোধহয়!

[দ্রুতপায়ে গিয়ে দরজা খোলে। অরুণ মঞ্চে প্রবেশ করে।]

অরুণ—বউদি, শুভঙ্করদা কোথায়?

সুতপা—ও একটু দোকানে গেছে। চলে আসবে এক্ষুনি। তুমি বসো।

অরুণ—সৌম্য কোথায়?

সুতপা—ও এইমাত্র বাড়ি ফিরল।

অরুণ—কেন কোথায় গিয়েছিল?

সুতপা—বাবুর এক বন্ধু আছে, অরিত্র, ওর মা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তাই বাবু হাসপাতালে গিয়েছিল সেই কোন ভোরে! এখন বাড়ি ফিরল। তুমি একটু বসো আমি চটকরে ওর জন্য একটু জলখাবার বানিয়ে দি। তুমি কি জলখাবার খাবে?

অরুণ—না বউদি, আমি জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি।

সুতপা—ঠিক আছে, তুমি বসো।

[সুতপা দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়। অরুণ চেয়ারে বসে মোবাইল দেখতে থাকে। একটু পরে আবার দরজায় বেল বেজে ওঠে। সুতপা ভিতর থেকে বলে—যাই।]

অরুণ—আমি দেখছি বউদি।

[ চেয়ার থেকে উঠে দ্রুতপায়ে গিয়ে দরজা খোলে। শুভঙ্কর মঞ্চে প্রবেশ করে।

শুভঙ্কর—আরে অরুণ যে! কখন এলি।

অরুণ—এইতো একটু আগে।

শুভঙ্কর—তুই এসে ভালো করেছিস। খুব জরুরি কথা আছে তোর সঙ্গে। সুতপা এই জিনিসগুলো নিয়ে যাও। আর একটু জল দাও। উফ বাইরে যা গরম।

[সুতপা ভিতর থেকে উত্তর দেয়— যাচ্ছি। শুভঙ্কর আর অরুণ মুখোমুখি চেয়ারে গিয়ে বসে। সুতপা জলের গ্লাস হাতে মঞ্চে প্রবেশ করে।]

সুতপা—এই নাও জল। কতবার বলেছি ছাতা নিয়ে বেরিয়ো।

শুভঙ্কর—(ঢকঢক করে গ্লাসের জল শেষ করে) ঠিক আছে। এই নাও তোমার দোকানের জিনিস। (থলিটা সুতপার হাতে দেয়।) ভালো করে দেখে নাও সব ঠিক ঠাক এনেছি কিনা? উফ্, সত্যর দোকানে কী ভিড়।

সুতপা—(থলি হাতে নিয়ে) ঠিক আছে।

শুভঙ্কর—বলছি কী, অরুণ এসেছে, ওকে একটু চা খাওয়াও। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাকেও একটু দিও।

সুতপা—এতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কী আছে। দিচ্ছি।

[সুতপা দ্রুত পায়ে ভিতরে চলে যায়।]

অরুণ—শোন, রামনবমীর সব অ্যারেঞ্জমেন্ট মোটামুটি কমপ্লিট।

শুভঙ্কর—বাঃ। কিন্তু এবারে রামনবমীতে একটু গণ্ডগোল হতে পারে।

অরুণ—কেন?

শুভঙ্কর—আর বলিস না। এই আমাদের এখানকার কাউন্সিলর ভাস্কর আর তার দুই সাগরেদ রঘুর চায়ের দোকানে বসেছিল। আমি সত্যর দোকানে যাচ্ছি হঠাৎ আমায় ডেকে বলে কী জানিস, রামনবমীর পূজা করা যাবে না। রাম নাকি বহিরাগত। আমি অবশ্য ওদের কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। উলটে ওকেই পুজোয় আসার নিমন্ত্রণ করে দিয়েছি। কিন্তু তবু এবার আমাদের একটু সাবধানে পূজাটা করতে হবে। কারণ ওরা কিন্তু এবার গণ্ডগোল পাকাতে পারে।

অরুণ—বলো কী? এতো বড় সাহস?

শুভঙ্কর—তাহলে আর বলছি কী?

অরুণ—না, আমি ভাবছি ও বললো কী করে রামচন্দ্র বহিরাগত? অবশ্য হবে নাই-বা কেন? যাদের দলের প্রধান জয় শ্রীরাম শুনলে বলে গালাগালি! সেই দলের লোকেরা এর থেকে বেশি কী বলবে!

শুভঙ্কর—একদম ঠিক বলেছিস। আসলে কী জানিস, এই একমাত্র আমাদের ধর্মের লোকেরাই। বিশেষ করে বাঙ্গালি হিন্দুরা সেকুলারের মুখোশ পরে হিন্দুধর্মেরই সব থেকে বেশি ক্ষতি করতে চাইছে।

অরুণ—অথচ এদের বাপ-ঠাকুরদা বাংলাদেশে মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে, মহিলাদের সম্মান হারিয়ে ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে ছিন্নমূল হয়ে এই দেশে আশ্রয় নিয়েছিল। আর এখন তারাই পুরানো ইতিহাস ভুলে গিয়ে সেকুলারের মুখোশ পরে হিন্দুধর্মেরই প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে? রবিঠাকুর যে লিখে গেছেন 'সপ্তকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি', এটা তো কত বড় সত্য তা আজ আমরা বুঝতে পারছি।

শুভঙ্কর—ঠিক বলেছিস।

অরুণ—তবে শুভঙ্করদা, রামনবমীর দিন শ্রীরামচন্দ্রের পূজা আমরা করবোই। সে যে যতই বাধা দিতে আসুক না কেন? তার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

শুভঙ্কর—দেখ, বাধা বলতে ওরা এটা করবে। নিরালার মাঠে আমাদের পূজার প্যান্ডেল করার পুলিশ পারমিশনটা আটকাবে। আর ক্লাবের ছেলেদেরও একটু থ্রেট করে ওরা শ্রীরামচন্দ্রের পূজা আটকাতে চেষ্টা করবে। এটা ছাড়া ওরা আর কিছু করতে পারবে না। তবে এইসব করেও ওরা পূজা আটকাতে পারবে না। দরকার হলে পূজা আমার বাড়িতে হবে।

[সুতপা চায়ের ট্রে হাতে মঞ্চে প্রবেশ করে। তারপর দুটি চায়ের কাপ ওদের সামনে টেবিলের উপর রাখে।]

সুতপা—উফ, যা গরম পড়েছে আর পারছি না। বাবুটাও বাড়ি ফিরে স্নান করে জলখাবার খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

*With Best Compliments from -*

# Ganpati Laminators
# &
# Packagers Pvt. Ltd.

Mfg. of HDPE and PP Woven Bags and Fabric

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

# Usha Kamal

শুভঙ্কর—(চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে) বাবু বাড়ি ফিরে এসেছে? তা কেমন আছে বলল ওর বন্ধুর মা?

সুতপা—বলল তো ভালো নয়। ঠিক আছে তোমরা কথা বলো। আমি ভিতরে যাই। রান্না ঘরে এখন অনেক কাজ বাকি।

[সুতপা ঘরের ভিতর চলে যায়।]

অরুণ—কিন্তু আমি তো ডেকোরেটরকে নিরালার মাঠে প্যান্ডেল করতে বলে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিয়েছি।

শুভঙ্কর—ঠিক আছে এত চাপ নেওয়ার কিছু নেই। আমরা তো পুলিশ পারমিশনের জন্য চিঠি জমা করেছি। দেখি না কী হয়!

অরুণ—আর না হলে তো তুমি আছোই। আদালতে ঠুকে দেবে একটু।

শুভঙ্কর—সে সব পরে দেখা যাবে। আমি শুধু ভাবি, জানিস অন্য ধর্মে কিন্তু আমাদের ধর্মের মতো মেকি লোক নেই। ধর, এটা যদি কোনো মুসলমানদের অনুষ্ঠান হতো তাহলে কি কোনো মুসলমান বলত এটা বহিরাগত অনুষ্ঠান, এটা আরবের সংস্কৃতি? বলত না।

অরুণ—ওদের মধ্যে তো আর সেকুলার নেই।

শুভঙ্কর—অথচ দেখ যারা রামকে বহিরাগত বলে তারাই পঁচিশে ডিসেম্বর কেক খেয়ে যিশুর জন্মদিন পালন করে, তখন কিন্তু বলে না যিশু বহিরাগত।

অরুণ—এদের ভয় শুধু রামে। আর রামে যারা ভয় পায় তাদের কী বলে মানুষ সেটা জানে।

শুভঙ্কর—আমার হাসি পায় জানিস। যখন এদের মুখেই শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের কথা শুনি। দেওয়ালে, লাইট পোস্টে যখন দেখি এই মহাপুরুষদের বাণীগুলো লিখে তার উপরে অমুকের অনুপ্রেরণায় আর নীচে সৌজন্য অমুকের নাম লিখে রাখে। আর এটা দেখে আমার মনে হয় বিশেষ কারও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই মহাপুরুষরা এই বাণীগুলি লিখতে বা বলতে পারতেন না।

অরুণ—দারুণ বলেছ।

শুভঙ্কর—যেখানে বিবেকানন্দ বলেছেন দেশে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা চালিয়ে দে দিকি। দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তির পূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। আর সেখানে এদের কতবড় সাহস শ্রীরামচন্দ্রকে বলে বহিরাগত। তুই ভাব একবার। আমরা কোন রাজ্যে বাস করছি।

অরুণ—সত্যিই তাই। তবে একদিন আসবে যেদিন এরাই আবার জয় শ্রীরাম বলে চিৎকার করে প্রমাণ করবে ওরা কতবড় হিন্দুত্ববাদী।

শুভঙ্কর—একদমই তাই। যাকগে কাজের কথায় আসি। বিকাশের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?

অরুণ—হ্যাঁ, গতকালই দেখা হয়েছিল।

শুভঙ্কর—মুর্শিদাবাদের ওই ছেলেটি কী যেন নাম—বাপ্পা, ওর খবর কী?

অরুণ—হ্যাঁ ও এখন ভালোই আছে। বিকাশের সঙ্গে ওর বাড়ির লোকের কথা হয়েছে। বিকাশ বলল ডাক্তার বলেছে বাপ্পাকে এখন বেশ কিছুদিন কমপ্লিট রেস্টে থাকতে হবে। আর মেডিসিন প্রপারলি চালাতে হবে। আর মাসে একবার চেকআপ করতে কলকাতায় আনতে হবে।

শুভঙ্কর—যাক বাবা, ভগবানের দয়ায় ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। যা অবস্থায় নিয়ে এসেছিল।

অরুণ—ঠিকই তাই। তবে তুমি যা করেছ ওর জন্য।

শুভঙ্কর—শুধু আমি নই, আমরা সবাই মিলে করেছি। আমি কি একা কিছু করতে পারতাম তোদের সহযোগিতা ছাড়া?

অরুণ—না দাদা। তুমি নিজে যেভাবে একা ওর চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে ওকে ভর্তি করিয়ে সুস্থ করে তুললে। সেটা আমরা সবাই জানি। হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই তোমার সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু মূল কাণ্ডারি ছিলে তুমি। ও ভালো কথা, বলতেই ভুলে গেছি, রামনবমীর দিন বাপ্পার বাবা আসবেন আমাদের পূজাতে।

শুভঙ্কর—সে তো ভালোকথা।

অরুণ—ঠিক আছে শুভঙ্করদা আমি এখন বাড়ি যাই। রাতে চেম্বার থেকে ফেরার পথে তুমি রঘুর চায়ের দোকানে আসছ তো?

শুভঙ্কর—হ্যাঁ আসব।

অরুণ—তাহলে রাতে দেখা হচ্ছে।

[অরুণ ধীরগতিতে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর শুভঙ্করের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।]

অরুণ—আরে, তোমাকে একটা মজার কথা বলতেই ভুলে গেছি।

শুভঙ্কর—মজার কথা! কী রে?

অরুণ—আমাদের পাড়ার ছকুদা আছে না।

শুভঙ্কর—কোন ছকু?

অরুণ—আরে ঐ কমরেড ছকু।

শুভঙ্কর—হ্যাঁ—হ্যাঁ কী হয়েছে ওর?

অরুণ—আরে ও যা কাণ্ড ঘটিয়েছে সেটা শুনলে তুমি না হেসে থাকতে পারবে না।

শুভঙ্কর—কী রকম?

অরুণ—আধার কার্ডে ওর নামে কী একটা ভুল ছিল। সেটা ঠিক করাতে গিয়ে ও ওখানকার কর্মরত দুজনের সঙ্গে তুমুল গণ্ডগোল করেছে।

শুভঙ্কর—কী কারণে?

অরুণ—সেই কারণটাই তো খুব মজার। ব্যাপারটা হয়েছে কী, ছকুদার বাবার নাম শশাঙ্ক শেখর। তখন কাউন্টারে বসা দুজন কম্পিউটরে কাজ করতে করতে নিজেদের মধ্যে পয়লা বৈশাখ নিয়ে কথা বলছিল। আর সেই কথার মধ্যে ওঠে শশাঙ্কের নাম। ছকুদা তা শুনে একেবারে রেগে লাল হয়ে

ওদের দুজনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। শশাঙ্ক নয়, ওটা আকবর হবে। ওরা কিছু বলার আগেই ছকুদা গর্জে ওঠে বলে, যত সব হিন্দুত্ববাদীদের দল। আমাদের লেখা ইতিহাসকে বিকৃত করতে চেষ্টা করছে। রোমিলা থাপারের ইতিহাসটাও পড়েনি। এখানে বসে শুধু হিন্দুত্বের প্রচার করছে। কর্মরত একজন ছকুদাকে প্রশ্ন করে আপনি ঠিক বলছেন? এটা শশাঙ্ক নয়, আকবর হবে। আলবাত হবে বলে গর্জে ওঠে ছকু দা। এরপর ওরা বলে তাহলে পুরো নামটা ইংরেজি ও বাংলায় লিখে দিন। ছকুদা বলে ওঠে এটাও নিজেরা লিখতে জানেন না। কতদূর পড়াশোনা করেছেন। কাগজ দিন লিখে দিচ্ছি বলে ওদের দেওয়া কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা ও ইংরেজিতে লিখে দেয় জালালউদ্দিন মহঃ আকবর। তারপর মুখে বিজয়ীর হাসি নিয়ে চলে আসে বাড়িতে। কিছুদিন পরে পোস্টে ছকুদার বাড়ি আধার কার্ড আসে। আঁধার কার্ড দেখে ছকুদার অবস্থা খারাপ। ছকুদার ভালো নাম সৌমেন দাস। কার্ডে লেখা আছে সৌমেন দাস পিতার নাম জালাউদ্দিন মহঃ আকবর।

শুভঙ্কর—হা হা হা হা

[দুজনে একসঙ্গে হাসতে থাকে।]

শুভঙ্কর—তারপর কী হলো?

অরুণ—সেই খবর আর জানি না। ও এলে জিজ্ঞেস করব।

শুভঙ্কর—ও এখন কোথায়?

অরুণ—ওতো ব্যাঙ্গালুরু গেছে মেয়ের কাছে। ওর মেয়েতো ওখানে চাকরি করে। শুনেছিলাম ছকুদার মেয়ে নাকি কোনো এক মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছে।

শুভঙ্কর—হুম। এটা আমিও শুনেছি।

[ সৌম্য আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে মঞ্চে প্রবেশ করে।]

অরুণ—আরে সৌম্য যে! খবর কী তোর?

সৌম্য—(হাই তুলে) ভালো। তুমি কি চলে যাচ্ছ কাকু?

অরুণ—হ্যাঁ রে। আমি অনেকক্ষণ এসেছি। এবার যেতে হবে। এই শুভঙ্করদা, তাহলে এখন আমি আসছি। রাতে দেখা হচ্ছে তোমার সঙ্গে। এই সৌম্য আসছি রে।

[শুভঙ্কর আর সৌম্য দুজনেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। অরুণ মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়।]

সৌম্য—বাবা, তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

শুভঙ্কর—হ্যাঁ বল।

সৌম্য—তুমিতো শুনেছ অরিত্রর মায়ের ঘটনাটা।

শুভঙ্কর—হ্যাঁ, তোর মার কাছে শুনলাম। এখন উনি কেমন আছেন?

সৌম্য—ভালো নেই। বাঁচবার সম্ভাবনা কম। শোন না অরিত্র এখন খুবই চাপে আছে। একদিকে ওর মার অবস্থা খারাপ হচ্ছে অন্যদিকে পুলিশ বারবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

শুভঙ্কর—সেতো করবেই।

সৌম্য—তুমি কিছু কর না ওর জন্য।

শুভঙ্কর—আমি কী করব? পুলিশের যা কাজ পুলিশ তাই করছে। বার্ন কেসের ক্ষেত্রে পুলিশ এনকোয়ারি করবেই।

সৌম্য—না, আসলে ও খুব চাপে আছে তো।

শুভঙ্কর—তুই ওর পাশে থাকিস।

সৌম্য—সে তো আছিই। আসলে, ঠিক আছে তেমন বড়ো কোনো আইনগত সমস্যা হলে তোমাকে বলবো। তখন তুমি একটু সাহায্য করে দিও।

শুভঙ্কর—নিশ্চয়ই।

[ ভিতর থেকে সুতপা বলে কী গো অনেক বেলা হলো। আজকে কি আর খাওয়াদাওয়া করবে না।]

শুভঙ্কর—চল চল, অনেক বেলা হয়ে গেছে, তুই খেতে বোস আমি চট করে স্নানটা সেরে আসছি।

[মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়।]

**প্রথম অঙ্ক**

**পঞ্চম দৃশ্য**

[ অন্ধকার মঞ্চ নেপথ্যে ভেসে আসছে গর্জন, সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ। মাঝে মধ্যে বাজ পড়ার শব্দ। মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হলে দেখা যায় শুভঙ্করের ঘর। সেখানে মুখোমুখি চেয়ারে বসে শুভঙ্কর ও সুতপা।]

সুতপা—উফ, যা গরম পড়েছিল। তাতে এই বৃষ্টিটার খুব দরকার ছিল। রাতে তাও একটু শান্তিতে ঘুমানো যাবে।

শুভঙ্কর—হুম।

সুতপা—কী, তখন থেকে চিন্তা করছ বলত?

শুভঙ্কর—না, ভাবছি এই বৃষ্টির মধ্যে চেম্বারে যাব কী করে?

সুতপা—আজকে চেম্বারে যেও না। এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ যায়।

শুভঙ্কর—আসলে পরশু কোর্টে একটা কেস ফাইলিং করতে হবে। ভদ্রলোকের আসার কথা আছে। কী করা যায় সেটাই ভাবছি।

সুতপা—ভদ্রলোক এলে নিশ্চয়ই গোপাল ফোন করে তোমাকে জানাবে।

শুভঙ্কর—হুম ,সে তো জানাবেই। কিন্তু গোপাল কি আজ চেম্বার খুলতে পারবে? একে এই বৃষ্টি, তারপর ওর বাড়ির সামনে রাস্তায় যা জল জমে। দেখি একবার ফোন করে ওকে জিজ্ঞেস করি।

(হঠাৎ শুভঙ্করের ফোন বাজতে শুরু করে।)

হ্যালো, হ্যাঁ মিঃ চ্যাটার্জি বলুন। হ্যাঁ এখানেও খুব বৃষ্টি হচ্ছে। হুম হুম। সেই ভালো আপনি বরং আগামীকালই আসুন। হ্যাঁ হ্যাঁ আগামী পরশু আপনার কেস ফাইল করব। না-না একদম চিন্তা করবেন না। হ্যাঁ ঠিক আছে কালকে টাকা দিলে চলবে। সেটা আপনার ইচ্ছে। আপনি অনলাইনেও করতে পারেন। ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি

কালকে চেম্বারে আসুন। আচ্ছা ঠিক আছে রাখছি। নমস্কার।

সুতপা—তাহলে এখন আর বেরুবে না তো?

শুভঙ্কর—এই বৃষ্টিতে কী করে বেরুব।

সুতপা—তাহলে তুমি বসো। আমি একটু পেঁয়াজি ভাজি। এই বৃষ্টিতে পেঁয়াজি আর গরম চা একেবারে জমে যাবে।

শুভঙ্কর—এতো মেঘ না চাইতেই জল।

[শুভঙ্করের ফোন বাজতে শুরু করে।]

হ্যাঁ অরুণ বল। নারে চেম্বারে যেতে পারিনি। এত বৃষ্টির মধ্যে বেরুবি কী করে? ঠিক আছে তুই যদি আসতে পারিস আয়। সঙ্গে কে আছে? সোনালি? কে? ও ঠিক আছে নিয়ে আয়। (ফোন কেটে দিয়ে) সুতপা, তোমার পেঁয়াজি খাওয়ার লোক বেড়ে গেল।

সুতপা—অরুণ ঠাকুরপো আসছে?

শুভঙ্কর—শুধু ও একা নয়। সঙ্গে আর একজনও আসছে।

সুতপা—কুছ পড়োয়া নেহি।

[সুতপা চেয়ার ছেড়ে উঠে। 'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে' গাইতে গাইতে ঘরের ভিতর চলে যায়। শুভঙ্কর সুতপার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর মৃদু হেসে গোপালকে ফোন করে।]

শুভঙ্কর—বলছি কী, গোপাল আজকে আর চেম্বারে যাব না বুঝলি। হ্যাঁ বুঝতে পারছি তোর বাড়ির সামনেও খুব জল। কাল সকালে কিন্তু দশটার মধ্যে চেম্বার খুলতে হবে। ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই। তোর মায়ের শরীর ভালো আছে তো? বেশ বেশ। হ্যাঁ ঠিক আছে রাখছি। (ফোন টেবিলের উপর রাখে। তারপর গলাছেড়ে গেয়ে ওঠে)

**আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে**
**জানি নে, জানি নে,**
**কিছুতে কেন সে মন লাগেনা।**
**ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে**
**আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে।**

[দরজায় বেলের শব্দ। শুভঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খোলে। অরুণ এবং সোনালি মঞ্চে প্রবেশ করে। অরুণ ও সোনালি দুজনেই ছাতা বন্ধকরে ঘরের এককোণে রাখে। তারপর অরুণ হঠাৎ চোখ বন্ধ করে গন্ধ শুঁকে।

অরুণ—''আমি এসেছি, আমি এসেছি,
এসেছি বউদিগো, খেতে গরম পেঁয়াজি।''

শুভঙ্কর—হা হা হা, সুতপা দেখ অরুণ কী করছে।

[ভিতর থেকে সুতপা উত্তর দেয়। আমি অরুণ ঠাকুরপোর গান শুনতে পেয়েছি। আমারও ভাজা হয়ে গেছে দিচ্ছি।]

শুভঙ্কর—এই অরুণ তুই বোস। আপনিও বসুন।

অরুণ—আরে ওকে আপনি বলছ কেন? ও আমার ভাগনি, আমার বড়দিদির মেয়ে। দুপুরে তোমার এখান থেকে বাড়ি ফিরে দেখি ওরা এসেছে। তাই এখন সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

শুভঙ্কর—বড়দিদি মানে মিতালিদি?

অরুণ—হ্যাঁ।

শুভঙ্কর—ও তুমি মিতালিদির মেয়ে। বসো, বসো, ওকে কত ছোট দেখেছি। মিতালিদি নাগপুর না কল্যাণ কোথায় যেন থাকে?

সোনালি—(শুভঙ্করকে প্রণাম করে) হ্যাঁ, আমরা কল্যাণে থাকি। যদিও আমি এখন মুম্বাইতে আছি।

শুভঙ্কর—ও আচ্ছা। তা তুমি ওখানে কি চাকরি কর?

সোনালি—হ্যাঁ, আমাকে আসলে অফিস থেকে কোয়ার্টার দিয়েছে। আগে বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতাম।

অরুণ—ও লেখাপড়ায় খুব ভালো। এক চান্সেই ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে।

শুভঙ্কর—বাহ, খুব ভালো। বাবা-মা কি তোমার সঙ্গে থাকেন?

সোনালী—না থাকেন না। মাঝে মধ্যে গিয়ে এক আধদিন থাকে।

অরুণ—আমার দিদি ও জামাইবাবু দুজনেই অদ্ভুত। মেয়েটা একা একা এত দূরে।

সোনালি—না না, বেশি দূর না। আসলে বাবা থাকতে চায়, কিন্তু মা থাকতে চায় না। মা'র মুম্বাই ভালো লাগে না।

[সুতপা তিনটি প্লেটে পেঁয়াজি সাজিয়ে সেটা একটি ট্রের উপর রেখে ট্রে হাতে মঞ্চে প্রবেশ করে। টেবিলে তিন জনের সামনে প্লেটগুলি সাজিয়ে দেয়।]

শুভঙ্কর—সুতপা ওকে চিনতে পারছ? ও হচ্ছে সোনালি। অরুণের ভাগনি। মিতালিদির মেয়ে।

[সোনালি সুতপাকে প্রণাম করে।]

সুতপা—থাক থাক মা। (সোনালির চিবুক ধরে আদর করে।)

সুতপা—খুব মিষ্টি মেয়ে। তুমি বসো আমি একটু চা করে আনি।

[সুতপা দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়।]

অরুণ—(খেতে খেতে) এই বৃষ্টির দিনে গরম গরম এমন পেঁয়াজি আহা মন ভরে গেল।

শুভঙ্কর—সোনালি তুমি খাও।

সোনালী—হ্যাঁ খাচ্ছি। আমি আপনাকে শুভঙ্কর মামাবাবু বলি?

অরুণ—কেন, শুধু মামাবাবু বলতে অসুবিধা হচ্ছে?

শুভঙ্কর—আহা, ওর যেটা ভালো লাগে সেটাই বলুক না। হ্যাঁ তুমি শুভঙ্কর মামাবাবুই বলো। আমার শুনতে ভালোই লাগছে।

সোনালি—আসলে আপনার কথা মামুর মুখে, মায়ের মুখে অনেক শুনেছি। কলকাতায় আমার খুব কম আসা হয়। শেষ কবে এসেছিলাম এখন ঠিক মনে নেই। তাই আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু

শুনলেও আপনার সঙ্গে সামনাসামনি পরিচয় হয়নি। আপনার থেকে আমার অনেক কিছু জানার আছে।

শুভঙ্কর—আহা, এত সংকোচ করছ কেন? বলো কী জানতে চাও।

সোনালি -- আসলে মামাবাবু, আমি হিন্দুত্ব নিয়ে কিছু জানতে চাই।

শুভঙ্কর—সেতো ভালো কথা। বলো তোমার কী জানার আছে।

সোনালি—হিন্দুত্ব আর হিন্দুইজম কি এক?

শুভঙ্কর—দেখ, হিন্দুত্ব কোনো নিছক একটি শব্দ নয়। হিন্দুত্ব থেকেই উৎপন্ন একটি পৃথক শব্দ হলো হিন্দুইজম। হিন্দুইজমকে তুমি হিন্দুত্বের একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বলতে পার। আসলে ইজম বলতে আমরা কী বুঝি? কোনো একটি নির্দিষ্ট সূত্র বা কোনো ধর্মীয় অন্ধ মতবাদ বা কোনো নৈতিক কাজের ভিত্তির উপর কোনো মতবাদ। কিন্তু যদি আমরা হিন্দুত্বের মূল ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করি তাহলে আমরা দেখতে পাব, কোনো অন্ধ মতবাদ বা কোনো ব্যক্তির আদর্শের মধ্যে আমরা আবদ্ধ নই। এবং হিন্দুজাতির সকল চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপ হিন্দুত্ব শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তারমানে কী দাঁড়াল হিন্দুইজম শব্দটি সঙ্কীর্ণ ও সীমিত। আর হিন্দুত্ব শব্দটি অসীম। বোঝাতে পারলাম?

সোনালি—বুঝেছি।

[সুতপা চা নিয়ে এসে সবাইকে দেয়।]

শুভঙ্কর—তোমার আর কিছু জানার আছে?

সোনালি—হ্যাঁ আরও কয়েকটি বিষয়ে জানার আছে।

শুভঙ্কর—বলো কী জানতে চাও?

সোনালি—আচ্ছা, হিন্দু শব্দটি কি মুসলমানদের দেওয়া?

শুভঙ্কর—না না, একদমই নয়। এর একটা বিরাট ইতিহাস আছে। তুমি যেটা বললে সেটা সম্পূর্ণ ভুল এবং বিকৃত ইতিহাস। এর মধ্যে কোনো সত্যতা নেই। ইতিহাসের পাতায় যখন আরব জাতির খোঁজ পাওয়া যায়, তারও বহু আগে থেকে এই সুপ্রাচীন দেশ বিদেশের কাছে 'সিন্ধু' বা 'হিন্দু' নামে পরিচিত ছিল। আরবীয়রা এই নাম আবিষ্কার করেনি। মুসলমানরা আমাদের কাফের বলে। এটা কি আমরা সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছি? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আমরা জানি ওরা এটা বলে আমাদের অপমান করে। তাই যদি 'হিন্দু' নামটি আরবীয়দের থেকে আমরা পেতাম। সেটা আমাদের কাছে গৌরবের হতো না। হতো অপমানের। শুধুমাত্র 'হিন্দু' বা 'হিন্দুস্থান' এই দুই শব্দের বেলায় আমরা অপমান স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলাম। এই কথাটি যদি সত্যি ভাবি, তবে সেটা হবে আমাদের চরম মূর্খামি। একটা কথা মনে রেখো আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু আধুনিক হিন্দুদের মতো জাতীয় জীবন থেকে বিচ্যুত বা ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলেন না।

সোনালি—তাহলে প্রাচীন সংস্কৃতে হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই কেন?

শুভঙ্কর—খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। দেখ এক সময় এই দেশে আদিম অধিবাসী ছিল—বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর। এদের সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরা সেই সময় তাদের গাইড রূপে কাজ করেছিলেন। তাদের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য 'হ' কে 'স' এ পরিণত করে। 'হ' এর সংস্কৃত রূপ হচ্ছে 'স'। শুধু 'হিন্দু' শব্দ নয়, বহু নিত্য ব্যবহার্য শব্দের উল্লেখ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। যেমন ধরো বেনারস। বেনারস শব্দ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। এটি সংস্কৃত বারাণসী শব্দের প্রাকৃত রূপ। তেমনি 'হিন্দু' শব্দও একটা সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত রূপ। কাজেই সংস্কৃত শব্দের মধ্যে কোনো প্রাকৃত শব্দকে খোঁজাটা মূর্খামি।

[সৌম্য ঘর প্রবেশ করে।]

অরুণ—কী রে তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলিস?

সৌম্য—অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছিলাম।

সুতপা—সোনালি, এই হলো আমার ছেলে বাবু, ওর ভালো নাম সৌম্য, ও কলেজে পড়ায়।

সোনালি—(মৃদু হেসে) নমস্কার।

সৌম্য—নমস্কার।

সুতপা—আর এ হলো সোনালি। তোর অরুণ কাকুর ভাগনি। খুব ভালো মেয়ে, ব্যাংকে চাকরি করে। মুম্বাইতে থাকে।

সৌম্য—বলছি কী আমাকে এখুনি একটু বেরুতে হবে। বাবা, তোমার গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছি।

শুভঙ্কর—এই ঝড়-জলের মধ্যে কোথায় যাবি?

সৌম্য—অরিত্রর মা মারা গেছে। ও ফোন করেছিল এখন।

সুতপা—কী বলছিস!

সৌম্য—হ্যাঁ, একটু আগেই এক্সপেয়ার করে গেছে। ও খুব ভেঙে পড়েছে। ওর পাশে এই সময় আর কেউ নেই।

সুতপা—আহারে ছেলেটার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

অরুণ—আমি কি যাব তোর সঙ্গে?

সৌম্য—না না, কাকু তোমাকে যেতে হবে না। আমি আমাদের দুই-একজন বন্ধুকে ফোনে বলছি। ওরা যাবে। বাবা, তোমার গাড়ির চাবিটা দাও। আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে ওদের তুলে নিয়ে চলে যাব।

সুতপা—এই দুর্যোগের রাতে তুই নিজে গাড়ি চালিয়ে যাবি? না না, তার থেকে গৌতমকে খবর দে।

শুভঙ্কর—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমি গৌতমকে ফোন করছি।

সৌম্য—আহা, বাবা কেন শুধু শুধু গৌতমদাকে ফোন করছ? আমি তো বলছি আমি ঠিক চলে যাব।

সুতপা—এই একদম কথা বলবি না।

খুব পাকামো। খুব বড় হয়ে গেছিস? তোর বাবা গৌতমকে ডাকবে, ও আসবে তারপর তোকে নিয়ে যাবে।

সৌম্য—মা ,তুমি সব সময় এমন কর, ভাল লাগে না। গৌতমদা এখন এই বৃষ্টির মধ্যে কী করে এত দূর থেকে আসবে বলো? আমি তো বলছি আমি ঠিক চলে যাব।

সুতপা—তুমি বললেই যে আমাদের সব কথা মানতে হবে এমনটাতো নয়। তোমার বাবা যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। আর সেটাই তোমাকে মেনে চলতে হবে।

সৌম্য—ধুস! তুমি না মা সব সময় এমন কর আমার একদম ভালো লাগে না। তার চেয়ে আমি এমনিই বেরুচ্ছি। আমার গাড়ির দরকার নেই।

সুতপা—নেই তো নেই। অমনি ছেলের রাগ হয়ে গেল। এই বৃষ্টির রাতে গাড়ি ছাড়া কী করে যাবি?

সৌম্য—ও আমি ঠিক ছাতা মাথায় দিয়ে চলে যাব। আমি দেখছি ওলা বা উবের যদি কিছু পাওয়া যায়।

শুভঙ্কর—না না, ওসবের দরকার নেই। তুই গাড়ি নিয়ে যা। কিন্তু সাবধানে চালাস।

সুতপা—তুমি ওকে একা গাড়ি নিয়ে যেতে বললে এই দুর্যোগের রাতে? ও কি ভালো গাড়ি চালাতে পারে না কি? কেউ একজন সঙ্গে থাকলে তাও।

সৌম্য—আমি ভালো গাড়ি চালাতে পারি না?

সুতপা—আমি সেই রকমই জানি। তোর বাবা তো আমাকে তাই বলেছে।

সৌম্য—বাবা তোমাকে এই কথা বলেছে? আমি বাবাকে কতবার কোর্টে পৌঁছে দিয়েছি। ঠিক আছে ,তোমাদের গাড়ি আমার লাগবে না। আমি ঠিক চলে যাব।

শুভঙ্কর—দেখ বাবু, এইসব অশান্তি আমার ভালো লাগে না। গাড়ির চাবি ফ্রিজের মাথায় আছে। যা নিয়ে যা। তবে রাতের খাবার খেয়ে তারপর যাবি।

সৌম্য—ঠিক আছে। তাহলে আমি ভিতরে যাচ্ছি। মা, একটু পরে তাহলে আমাকে খেতে দিয়ে দিও।

[সৌম্য দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতর চলে যায়। সুতপা তাকায় শুভঙ্করের দিকে।]

শুভঙ্কর—কী করব বলো? এখন ও বড় হয়ে গেছে? তারপর ওর বন্ধুদের ও কথা দিয়েছে গাড়ি নিয়ে গিয়ে ওদের বাড়ি থেকে রিসিভ করে তারপর যাবে।

সুতপা—কী আর বলব বলো? আমার কথা যখন কেউ শোনেই না।

তখন আর বলে লাভ কি? আমি রান্নাঘরে যাই। রাতের খাবার তৈরি করি গিয়ে।

[সুতপা দ্রুতপায়ে ভিতরে চলে যায়।]

শুভঙ্কর—কী ঝামেলা বলতো।

অরুণ—দেখ ওসব নিয়ে চিন্তা করো না। বাবু খুব ভালো ছেলে। ওর মতো ভালো ছেলে এই অঞ্চলে নেই। আর বাবু গাড়িটাও বেশ ভালোই চালায়। আমি দেখেছি।

শুভঙ্কর—আরে সেটা আমিও জানি। কিন্তু তোর বউদিকে সেটা কে বোঝাবে? যাই হোক, সোনালি তোমার আর কিছু জানার আছে?

সোনালি—আছে। আরও অনেক কিছু জানার আছে।

শুভঙ্কর—তুমি কি কাল পরশুই ফিরে যাবে নাকি আরও কিছু দিন থাকবে।

অরুণ—এখন পনেরো দিন এখানে ধরে রাখো।

সোনালী—না না, অতদিন থাকতে পারব না। আমার বেশ কিছু ছুটি জমে ছিল সেটাই নিলাম। মানে এক সপ্তাহের মতো এখানে আছি।

শুভঙ্কর—বেশ। তাহলে অন্য একদিন বসে তোমার প্রশ্ন শুনবো।

অরুণ—হ্যাঁ সেই ভালো। কী বলিস সোনালি। পরে একদিন বসে মামাবাবুর থেকে সব জেনে নিবি। আজ তাহলে ওঠা যাক। ওদিকে আবার তোর মা হয়তো চিন্তা করছে। চল চল, শিগগিরি বাড়ি পালাই। শুভঙ্করদা আজকে আসছি। পরে ফোন করে নেব।

[অরুণ ও সোনালি ধীরপায়ে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে আবছা হয়ে যায়। শুভঙ্কর চেয়ারে বসে গভীর মনযোগে কিছু পড়ছে। ঠিক তার অন্যপ্রান্তে একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায়। তার উপরে একটি হালকা আলোর বৃত্ত পরে। সেই আলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলে দেখা যায় বিবেক দাঁড়িয়ে।

বিবেক—কী, আমাকে চিনতে পারছেন তো। হ্যাঁ আমি সেই মানে আপনাদের বিবেক আবার ফিরে এসেছি। ভাবছেন আমি ফিরে এসেছি মানে গল্প এখানেই শেষ। না, কাহিনি অভি বাকি হ্যায় মেরে দোস্ত। এতক্ষণ যা দেখলেন তার থেকে হয়তো কিছু উপলব্ধি করেছেন। আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম নাট্যকার হয়তো কলমের ডগায় তারই চিত্র বর্ণনা করেছেন। যেখানে আমি হয়তো শুধু একটি চরিত্র হয়েই রয়ে গেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কোনো চরিত্র নই। আমার নিজস্ব একটা সত্তা আছে। যেটা হয়তো আপনি-আপনি-আপনি বা আপনারা সবাই কোনো না কোনো সময় উপলব্ধি করেছেন। ঠিক কি না বলুন? আপনারা প্রত্যেকে যখনই আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন তখনই আমি প্রতিবাদে গর্জে উঠেছি। আর তার ফল আপনারা হাতে নাতে পেয়েছেন। তবে এর পরে কী হবে? আমি কি শুধু চুপ করে গিয়ে সাধারণের ভিড়ে হারিয়ে যাব নাকি আমার দংশনে পথভ্রষ্ট মানুষের মধ্যেও তৈরি হবে নৈতিকতা। কী ভাবছেন বাকি গল্পটা বলে দিচ্ছি? তাহলে ভুল ভাবছেন। কারণ আমি বিবেক, নিয়তি নই।

[বৃত্তের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়। বিবেক মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়। শুভঙ্কর বই পড়ছে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ ধিরে ধিরে কমে আসছে। হঠাৎ কলিং বেলের শব্দ বেজে ওঠে।]

শুভঙ্কর—এখন আবার কে এলো? দরজা খোলা আছে ভিতরে আসুন।

[শ্রাবণী মঞ্চে প্রবেশ করে।]

শুভঙ্কর—আপনি?

শ্রাবণী—বড় বিপদে পরেই আপনার কাছে এই দুর্যোগের রাতে ছুটে এসেছি। আশাকরি আপনি আমাকে ফেরাবেন না। আমি শ্রাবণী দাস। আপনি হয়তো আমায় চেনেন না। তবে আশাকরি আমার স্বামীকে বোধহয় চেনেন, ওর নাম সৌমেন দাস, ডাকনাম ছকু।

শুভঙ্কর—ও আচ্ছা। তা আপনি দাঁড়িয়ে কেন বসুন।

শ্রাবণী—আমার বসার সময় নেই। আমার যে বড় বিপদ।

শুভঙ্কর—আপনি একটু শান্ত হন। জল খাবেন।

শ্রাবণী—না না, আমি কিছু খাব না। আমার মেয়েটাকে ওরা (হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে) শেষ করে ফেলবে দাদা।

[শ্রাবণীর কান্না শুনে সুতপা ভেতর থেকে চলে এসে দাঁড়ায়।]।

শুভঙ্কর—শেষ করে ফেলবে? কারা, কী হয়েছে পরিষ্কার করে খুলে বলুন।

শ্রাবণী—ওই লোকটা, সৌমেন দাস, ওর কুশিক্ষার জন্য এই পাপ লেগেছে। আমার মেয়েটার জীবন শেষ হয়ে গেছে। আজকে আপনার সামনে মুখ দেখাতে পারছে না। বৃষ্টির মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তবু ভেতরে ঢোকার সাহস নেই। কোন মুখে ঢুকবে?

শুভঙ্কর—সে কী, ছকুদা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? (হেঁটে দরজার দিকে এগিয়ে যায়)। ছকুদা, ভেতরে চলে আসুন।

[টলমল পায়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ছকু দাস। তারপর কান্নাভেজা ঝাপসা চোখে দুই হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে শুভঙ্করের পায়ের সামনে। শুভঙ্কর নীচু হয়ে দুহাত ধরে ছকুকে তুলে দাঁড় করায়।

ছকু—আর পারছি না শুভঙ্কর। বিবেকের এই যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত আমাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চুমার করে দিচ্ছে। আর পারলাম না থাকতে। আমি হেরে গেছি। আমি বুঝতে পারিনি আসল সত্যকে। সরাজীবন বামপন্থী রাজনীতি করেছি, নিজেকে মনে করে করতাম সাচ্চা কমিউনিস্ট। হিন্দু ধর্মকে মনে

করতে শিখেছি ফ্যাসিস্ট শক্তি। আর নিজের মতবাদ রোপণ করেছিলাম মেয়ের মনে। ওকেও ভাবতে শিখিয়েছিলাম হিন্দুধর্ম হলো আফিমের নেশা। এর জন্য তোমার বউদির সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়া হয়েছে। ও পূজার্চনা করতো। আর আমরা তাই দেখে হাসতাম। মেয়েকে শিখিয়েছিলাম হিন্দু-মুসলমান বলে কিছু হয় না। সমাজে শুধু দুটো শ্রেণীর মানুষ থাকে গরিব আর বড়লোক। মেয়েও তাই শিখেছিল। এই তোমাদের মতো যারা হিন্দুধর্মের রক্ষার্থে কাজ করো, তোমাদের বলতাম বুর্জোয়াদের দালাল, দাঙ্গাবাজ। আমার মেয়েটাও না আমার কথাগুলো সত্যি বলেই ভেবেছিল। তাইতো ব্যাঙ্গালুরুতে যখন চাকরি পেয়ে চলে গেল তখনও আমার কথাগুলো বেদবাক্য ভেবে মনে গেঁথে নিয়ে গেল। ওর মায়ের কথা কানেই তুললে না। এখন ভাবছি তুললেই বোধহয় ভালো হতো। তারপর ওখানে গিয়ে চাকরিতে জয়েন করলো, পরিচয় হলো ওদের অফিসের একজনের সঙ্গে, ছেলেটি মুসলমান। নাম আলতাফ হুসেন। কিন্তু তাতে কী, ছেলেটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ভালো চাকরি, ভালো পয়সা, ধর্ম বিশেষ মানে না। বেশ স্বাধীনচেতা। এই রকম ছেলেই তো চাই। তোমার বউদি আমার হাতে-পায়ে ধরে বারণ করেছিল। বলেছিল এ ভুল যেন না করি। কিন্তু আমি সৌমেন দাস আমি যা ভাবি তাই করি। আর মেয়ে যখন চাইছে তখনতো মানা করার প্রশ্নই ওঠে না। কিছু দিনের মধ্যেই ওরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে সেরে ফেলল। প্রথমে কিছুদিন সব ঠিক ঠাক ছিল। তোমার বউদিকে আমি বলতাম দেখেছ আমার জহুরির চোখ। কিন্তু এই বোকা মেয়ে মানুষটা তখনও চোখের জল ফেলত। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেল। ভয়ংকর অত্যাচার শুরু হলো আমার মেয়ের উপর। জোর করে ধর্ম পরিবর্তন করালো। তারপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। আমার মেয়েকে আমাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে দিত না। আমার মেয়ের আর এক বন্ধুও একই অফিসে চাকুরি করে। সে একদিন আমাকে ফোন করে সব কিছু বললো। বললো, কাকু, ওকে এসে নিয়ে যান না হলে ওরা আপনার মেয়েকে মেরে ফেলবে। সেদিন বুঝলাম 'লাভ জেহাদ', তোমরা যার বিরুদ্ধে লড়াই করে হিন্দু মেয়েগুলোর জীবন বাঁচাতে চাইছো। আমিও বুঝলাম কিন্তু বুঝতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তারপর আমি ওখানে গেলাম জানো। গিয়ে দেখি সে কী অবস্থা, আমার মেয়েতো অর্ধমৃত, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। আমি প্রতিবাদ করতে ওরা আমার উপর রে রে করে উঠল। কী করব, কোথায় যাব, এই ভাবতে ভাবতে গেলাম পুলিশের কাছে। কিন্তু পুলিশ ডায়েরি নিল না। তখন কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। তখন দেখি রাস্তা দিয়ে মাথায় গেরুয়া ফেট্টিবাঁধা কয়েকটি ছেলে যাচ্ছে। আমি ওদের কাছে দৌড়ে গেলাম, হাতজোড় করে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। ওরা আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা গেল আলতাফদের বাড়ি। তারপর প্রচণ্ড লড়াই করে ওরা আমার মেয়েকে উদ্ধার করে আমার হাতে তুলে দিল। শুধুই দিলই না, তারপর আমার হোটেল থেকে লাগেজ নামিয়ে আমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। এক সময় যাদের দেখে বলতাম গেরুয়া সন্ত্রাসবাদী। আজ তাদের সাহায্যেই নিজের মেয়েকে নিজের কাছে ফিরে পেলাম। আজ তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বাঁচাও শুভঙ্কর ,আমার মেয়েটাকে ওই জল্লাদদের হাত থেকে। আমার মেয়ের ডিভোর্সটা তুমি যে কোনো উপায় করিয়ে দাও। নাহলে মেয়েটাকে আর বাঁচাতে পারবো না।

[ছকু ও শ্রাবণী হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকে শুভঙ্করের সামনে। মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়। মঞ্চে প্রবেশ করে বিবেক। এসে দাঁড়ায় সামনের দিকে। একটি হালকা আলো এসে পরে বিবেকের মুখে। ধীরে ধীরে আলো জোরালো হয়।]

বিবেক—ওরা হয়তো বুঝে গেছে, কিন্তু আপনারা কবে বুঝবেন? এই একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। ভাবছেন এখন শুভঙ্কর কী করবে? ও সেটাই করবে যেটি আমি ওকে ভাবাবো। আগামীকাল ভোরের নতুন সূর্যের মতো হয়তো ছকু-শ্রাবণীর জীবনেও নতুন সূর্য উঠবে। কিন্তু এতো নাট্যকারের কল্পনার চরিত্র। বাস্তবে যাদের জীবনে এই ঘটনা ঘটে গেছে বা ঘটে চলেছে বা ঘটবে তারা কী করবে? ছকু-শ্রাবণীদের মতো নতুন ভোরের সূর্যের দেখা পাবে? নাকি তাদের সূর্য চিরজীবনের মতো অস্তমিত হয়ে যাবে? কী জানি? তবে কী জানেন, ওসব ভাবনা আমার নেই। আরে কী মুশকিল বুঝতে পারলেন না। ঠিক আছে, বোঝাচ্ছি। আসল ব্যাপারটা হলো আমি কখনো কিছু ভাবি না। ভাবনার দায়িত্বটা আপনাদের, ভাবানোর দায়িত্বটা আমার। আমি ভাবিয়েছিলাম বলেই কিন্তু ছকুবাবু নিজের ভুল শোধরানোর একটা সুযোগ পেলেন। আবার যখন আপনাদের ভাবাবো তখন আপনারা আপনাদের মতো করে ভাববেন। আশাকরি বুঝে গেছেন। তাই এবার আমার পার্ট শেষ। শুধু বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসাকে বুকের ভিতরে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। আর প্রতিদিন অবসরে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করুন সব ঠিক আছে তো। দেখবেন বিবেক ঠিক উত্তর দেবে।

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসতে থাকে। নেপথ্যে ভেসে আসে রবি ঠাকুরের গান ''না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।'']

Shree Cement
SHREE
जंग रोधक
CEMENT
घर की ढाल,
सालों साल
SHREE
जंग रोधक
CEMENT
SHREE जंग रोधक CEMENT
Delhi Corporate & Marketing Office: Epitome, Building 5, 9th Floor, DLF Cyber City, Block-B, Gurugram - 122002.
Tel: +91-124-4699200
Kolkata Corporate Office: 21, Strand Road, Kolkata - 700001. | Tel: +91-33-2230 9601-04
www.shreecement.com